ক্ষয়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ১৯৬২

প্রকাশক ঃ
রেখা বিশ্বাস
'মাঙ্গলিক'
উত্তরায়ণ | মধ্যমগ্রাম
উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
দীননাথ সেন।

মুদ্রক ঃ
পৃথ্বীশ সাহা
অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলিকাতা-৯।

॥ রুকু ॥

রুকু, আমার একটা প্রবলেমের কথা তোমাকে বলব ?

বলবে ? বলতে পারো। কিন্তু আমার নিজেরই অনেক প্রবলেম দয়ী।

দয়ী একটু হাসল টেলিফোনে। বলল, তোমার প্রবলেমের কথা আর একদিন হবে রুকু। সেদিন আমার কাঁধে মাথা রেখে কেঁদো। কিন্তু আজ আমারটা শোনো। ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম।

রুকু খুব সাবধানী গলায় বলে, শোনো দয়ী, যদি বলতেই হয় তবে রেখে-ঢেকে বোলো। এই টেলিফোন কিন্তু ডাইরেকট নয়। ইচ্ছে করলে অপারেটর শুনতে পারে। তা ছাড়া আমার তো এক্সক্লুসিভ টেলিফোন নেই। যার টেবিলে টেলিফোন সে এইমাত্র বাইরে গেল, যখন তখন এসে পড়তে পারে।

এগুলোই কি তোমার প্রবলেম রুকু ?

এগুলোও। তবে আরো আছে। অনেক। গরীবদের যে কত-রকম থাকে।

বাজে বোকো না। তুমি এক কাঁড়ি টাকা মাইনে পাও, আমি জানি।

আমার পে-স্লিপটা তোমাকে একদিন দেখাবো। দেখো, সেখানেও কত প্রবলেম।

ইয়ার্কি বন্ধ করে একটু শুনবে ? খুব জরুরী কথা।

শুনছি।

তুমি মলয়কে একটু বুঝিয়ে বলবে যে, ও যা চাইছে তা হয় না।

কী হয় না দয়ী?

তুমি জানো না বুঝি? মলয় তোমাকে কিছু বলেনি?

মলয়ের সঙ্গে আমার দেখাই হয় না প্রায়। কী হয়েছে?

ও আমাকে নিয়ে ভাবছে। অ্যাণ্ড হি ইজ সিরিয়াস।

একটু খুলে বলো। কিছু বুঝতে পারছি না।

তুমিই তো খোলাখুলি কথা বলতে বারণ করলে।

আই উইথড্র।

অপারেটর শুনছে না তো!

শুনুকগে। বলো।

মলয় ইজ বিয়িং প্রিমিটিভ।

তার মানে?

ও বোধহয় বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবছে।

রুকু একটু চুপ করে থাকে, তারপর শান্ত ব্যথিত স্বরে বলে, ও।

শোনো রুকু, অত নিরাসক্তভাবে ব্যাপারটা নিও না। একটু সিরিয়াস হও। ও বোধহয় সত্যিই আমার প্রেমে পড়েছে। আগের মতো হাসিখুশি ইয়ারবাজ নেই, দেখা হলেই গম্ভীর হয়ে যায়। ভাল করে তাকায় না।

সেটা কি প্রেমের লক্ষণ দয়ী? বরং উল্টোটাই তো।

তোমাকে বলেছে।

তবে?

ও আমাকে লম্বা লম্বা চিঠি লেখে যে আজকাল। তাতে সব সেই বিয়ে-টিয়ের মতো সেকেলে বিষয় থাকে। আমি একটারও

জবাব দিইনি।

দাওনি কেন ?

বাঃ, চিঠি চালাচালির কি আছে বলো ! প্রায়ই তো দেখা হচ্ছে। আমি একদিন ওর চিঠির প্রসঙ্গ তুলেছিলুম, ও গম্ভীরভাবে বলল চিঠির জবাব চিঠিতেই নাকি দিতে হবে। কী বোকামি বলো তো ?

তুমি তো ওকে পছন্দই করতে দয়ী ?

সে তো অনেককেই করি।

তুমি ওর সঙ্গে ধলভূমগড় বেড়াতে গিয়েছিলে। একবার কোন ডাক-বাংলোয় ছিলেও দু-একদিন।

এখন বুঝি অপারেটর শুনছে না রুকু ? টেবিলের ভদ্রলোক বুঝি ফিরে আসেনি ? শোনো রুকু, জ্যাঠামশাইয়ের মতো কথা বোলো না। কোথাও বেড়াতে যাওয়া কিংবা এক সঙ্গে দু-একদিন কাটানো মানেই কি প্রেম ?

মানে তো জানি না দয়ী। ঠিক মানে হয়তো তুমি জানো। তবে ওরকমই একটা ভুল অর্থ সকলেই করে নিতে পারে।

তুমিও প্রিমিটিভ রুকু !

আমি কেবল লজিক্যাল হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে লজিক্যাল হতে যাওয়াটা পৃথিবীর পয়লা নম্বরের বোকামী।

তোমার লজিকটা তোমার পার্সোনাল। (নিজের ব্যক্তিগত যুক্তি অন্যের ওপর খাটানো কি ঠিক ?)

বাদ দাও। মাপ চাইছি। এবার যা বলেছিলে বলো।

তুমি সিরিয়াস হচ্ছো না রুকু। মলয় আমার বন্ধু, তুমি যেমন বন্ধু। তোমাদের কাউকে বিয়ে করার মানে একটা দুর্নীতিকে প্রশ্রয়

দেওয়া। ওরকমভাবে ভাবিনি তো তোমাদের কোনোদিন। মলয় সেটা বুঝতে চাইছে না। কী সুন্দর হুল্লোড়বাজ মজাদার ছেলেটা এখন কেমন প্যাঁচামুখো, গম্ভীর আর আনইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে। ইদানীং তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি?

রুকু শান্তস্বরে বলে, গত সপ্তাহে ও আমাকে মোটরবাইকের পিছনে বসিয়ে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল।

কোনো কথা হয়নি আমাকে নিয়ে?

না। ও আমাকে দিল্লি রোডে মোটরবাইক চালানোর তালিম দিয়েছিল অনেকক্ষণ। আমি কিছুতেই শিখব না, কিন্তু ও শেখাবেই। আমি ওকে বললাম, মোটরবাইক চালাতে শিখে আমার কোনো লাভ নেই, কেননা কোনোদিনই মোটরবাইক কেনার মতো পয়সা আমার হবে না। কিন্তু ওকে তো জানো।

জানি বলেই ভাবছি। তোমরা কি ওকে ভয় পাও রুকু?

হয়তো পাই।

কেন, ও কনডেমড খুনী বলে?

আস্তে দয়ী। এসব কথা টেলিফোনে কেন?

আমার কথাটার জবাব দাও।

সম্ভবত সেটাও একটা কারণ।

আমি কিন্তু সেই কারণে চিন্তিত নই। বরং ওটাই আমার কাছে ওর যা কিছু অ্যাট্রাকশন। ও যা করেছে তা পলিটিক্যাল কারণে।

আমাদের অফিসের টেলিফোন অপারেটাররা মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই লাইন কেটে দেয়। আজ দিচ্ছে না কেন জানো?

ইয়ার্কি মেরো না রুকু, কেন?

কাটছে না, কারণ অনেক স্কুপ নিউজ পেয়ে যাচ্ছে।

টেবিলের ভদ্রলোক ফিরে আসেনি তো ?

এখনো নয়।

শোনো রুকু, মলয়কে তুমি একটু বোঝাবে ?

ও বুঝবে কেন ? মলয়কে কোনোদিন কেউ কিছু বোঝাতে পারেনি।

তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করছ ?

না দয়ী। আমি বাস্তব অসুবিধার কথা বলছি। আমার চেয়ে মলয়ের আই কিউ বেশি, বুদ্ধি বেশি, যুক্তির ধার বেশি, মলয় আমার চেয়ে ঢের বেশি সফল। ওর তিন শো সি সি-র হোণ্ডা মোটরবাইক আছে, আমার যা জন্মেও হবে না। এমন কি ওর যে আর একটা অ্যাডেড অ্যাট্রাকশনের কথা তুমি বলেছিলে তাও আমার নেই। ছেলেবেলায় আমি কৌতূহলবশে একটা কুকুরছানাকে আছাড় দিয়েছিলাম। সেটা মরে যায় তক্ষুনি। সেই অপরাধবোধ আমার আজও আছে।

তুমি সব মানুষকেই একটু বাড়িয়ে দেখ রুকু। ওটা কিন্তু ইন-ফিরিয়ারিটি কমপ্লেকস। মলয় তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান হলে আমার জন্য পাগল হত না।

পাগল এখনো হয়েছে কি ?

আমি ফাইন্যালি রিফিউজ করলে হবে। পুরুষদের আমি চিনি।

রিফিউজ করলে মলয় পাগল হবে এমন নরম ছেলে ও নয় দয়ী। তুমি ভুল ভাবছ।

কিন্তু রিফিউজ করাটাও ভারি অস্বস্তিকর রুকু। এতদিনের বন্ধু, এত মেলামেশা, মুখের ওপর কি বলা যায় ? আমি রিফিউজ করলে ওর কিছু করার নেই জানি। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারছি না। আমাদের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ও এমন কমপ্লেকস করে তুলেছে যে,

আমি সব সময়ে নিজেকে নিয়ে লজ্জায় আছি। আমি চাই তুমি মিডিয়েটার হয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দাও। ওকে বোলো আমরা যথেষ্ট অ্যাডালট হয়েছি, ছেলেমানুষী আমাদের মানায় না।

আমাকে ভারী মুশকিলে ফেললে দয়ী। মিডিয়েটার হওয়ার মতো আর কাউকে পেলে না ?

(তোমার মতো ঠাণ্ডা মেজাজের লোক আর কেউ নেই। তোমাকে কোনোদিন রাগতে দেখিনি, উত্তেজিত হতে দেখিনি, তুমি কখনো কারো সঙ্গে তর্ক করো না, কাউকে অপমান করো না। তোমার চেয়ে ভাল মিডিয়েটার কোথায় পাবো ?) মলয়কে যদি কেউ বোঝাতে পারে তবে সে তুমিই।

টেলিফোনে রুকু হঠাৎ চাপা স্বরে বলে—টেবিলের লোকটি এসে গেছে দয়ী। সে আবার আমার বস।

আচ্ছা, ছাড়ছি। কিন্তু একটা কথা বলি, ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াস! আমি গত তিনদিনে কয়েকবার তোমাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমাদের টু-থ্রি লাইন অফিস টাইমে এত বিজি থাকে যে একদিনও লাইন পাইনি। আজই পেলাম।

আমি বুঝেছি দয়ী। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস।

ফোন রেখে রুক্মিণীকুমার তার দূরের টেবিলে গিয়ে বসল।

ভাগ্যক্রমে তার টেবিলটা জানালার ধারেই। কাচের বন্ধ শার্শির ওপাশে অবিরল বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। আজ বাড়ি ফিরতে বহুত ঝামেলা হবে। কলকাতার বৃষ্টি মানেই অনিশ্চয়তা, ভয়। তবু রুকু আজ অনেকক্ষণ বৃষ্টি দেখল। দেখতে দেখতেই ক্যানটিন থেকে দিয়ে-যাওয়া পনেরো পয়সার চা খেল দুবার, কলিগদের সঙ্গে খুব ভাসা-ভাসা অন্যমনস্ক আড্ডা দিল। বৃষ্টি দেখে সবাই পালাচ্ছে সুটসাট

করে। রুকু বসে রইল। অফিসের কাজ শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরে মরা আলোর দিন, ভেজা, স্যাঁতানো এক শহর। বাইরে যেতে ইচ্ছে করল না।

রুক্মিণী অনেকক্ষণ মলয় আর দয়াময়ীর কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু মনটা বার বার অন্য সব দিকে ঘুরে যাচ্ছে। দয়াময়ীর তো আসলে কোনো সমস্যা নেই। তার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, বাপের মস্ত কারবার। তার সব সমস্যাই তাই ভাবের ঘরে। তাকে নিয়ে ভাববে কেন রুকু? তবে মলয়ের কাছে একবার সে যাবে। বলবে, তুই না ছিলি পুরো নকশাল! কত লাশ ফেলেছিস! সেই তুই প্রেমের বাজারে হোঁচট খেলে সেটা বড় আফশোষ কি বাত।

কতকাল কারো প্রেমে পড়েনি রুকু! সময় পেল কোথায়? হায়ার সেকেণ্ডারির পর থেকেই টুইশানি করে পড়তে হত। এখনো অফিসের পর তাকে বাঁধা কোচিং-এ যেতে হয় সপ্তাহে তিনদিন। বড়বাজারে এক চেনা লোকের কাছ থেকে সস্তায় টেরিলিন-টেরিকটন কিনে দোকানে দোকানে বেচে বেড়ানোর একটা পুরোনো ব্যবসাও আছে তার। সেটা এখন ছোটো ভাই দেখছে। আছে জীবনবীমা আর পিয়ারলেসের এজেনসি। আগ্রাসী অভাব রয়েছে রুকুর। তারা তিন ভাই প্রাণপাত করে সংসারটা সামাল দিচ্ছিল। মেজোভাই মাত্র বাইশ বছর বয়সে পাড়ার একটা মেয়েকে হুট করে বিয়ে করে সরে পড়ল। এখন সে আর কুড়ি বছর বয়সের ছোটোভাই সংসার চালায়। চার-চারটে আইবুড়ো বোনের কথা ভাবলে রুকু বরাদ্দের বেশি এক কাপও চা খেতে ভরসা পায় না। বাবা বাংলাদেশ থেকে টাকা পাঠাতে পারে না, কিন্তু জমি আঁকড়ে পড়ে আছে।

তবু এইসব রুকুকে বেশি স্পর্শ করে না। জন্মাবধি সে অভাবে

মানুষ। ভাগ্যক্রমে তার পরীক্ষার ফল বরাবরই ভাল হত। যে কো-এডুকেশন কলেজে সে পড়ত সেখানে সে একগাদা বড়লোক বন্ধু আর বান্ধবী পেয়ে যায়। মলয় আর দয়ীও তাদের মধ্যে। কিন্তু মনে মনে রুকু জানে ওরা বন্ধু হলেও এক গোত্রের মানুষ নয়।

ভাগ্যই রুকুকে দেখেছে। এই বেসরকারী অফিসে হাজার খানেক টাকা মাইনের চাকরিটাও ভাগ্যই। তবু রুকু কখনো নিশ্চিত বোধ করে না, স্বস্তি পায় না। সে কোনো আশার কথা ভাবে না, স্বপ্ন দেখে না। সে কোনো মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসা হওয়ার কথা ভাবতে ভয় পায়।

তবু প্রেম নিয়ে অনেক ভেবেছে সে। ভাবতে ভাবতে আজকাল পুরো ব্যাপারটাই ভারী কাল্পনিক বলে মনে হয়। আগের দিনে মানুষের মন এক জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকতে ভালবাসত। মন বন্ধক দেওয়ার সেই ভাবের ঘরে চুরিকেই মানুষ প্রেম বলে সীলমোহর মেরে দিয়েছিল।

তখনো পাকিস্তান থেকে মা বা ভাইবোনেরা কেউ আসেনি, কুচবিহারে মেজো মাসীর বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করত রুকু। সেই সময়ে একদিন বৈরাগী দীঘিতে স্নান করতে যাওয়ার সময় লাটিমদের বাড়ি থেকে ওদের বুড়ি ঠাকুমা ডাক দিয়ে বলল, ও ভাই রুক্মিণী, আমার দেয়ালে একটা পেরেক পুঁতে দিয়ে যা। বৈশাখ মাসই হবে সেটা। নতুন একটা বাংলা ক্যালেণ্ডার টাঙাতে গিয়ে বুড়ো মানুষ নাজেহাল হচ্ছে। ক্যালেণ্ডারের পেরেক পুঁততে গিয়ে রুকুও নাজেহাল হল কম নয়। তবলা ঠোকার ছোটো হাতুড়ি দিয়ে গজালের মতো বড় পেরেক গাঁথা কি সহজ কাজ! হাতুড়ি পিছলে গিয়ে আঙুল থেঁতলে দেয় বার বার। যা হোক, সেটা তো ঘটনা

নয়। ঘটনা ঘটল পেরেক পোঁতার ব্যাপারটা জমে ওঠার পর। লাটিমের ছোড়দি তাপসী ঘরে আসার পর। বয়সে তাপসী হয়তো রুকুর চেয়ে বড়ই ছিল, না হলে সমান সমান! মুখশ্রী বা ফিগার কি খুব সুন্দর ছিল তাপসীর? তা রুকু আজ বলতে পারবে না। কিন্তু সেই প্রথম একটা মেয়েকে দেখে তার মনে হল একটা ঢেউ এসে যেন টলিয়ে দিল তাকে। সে ঢেউ সব কার্যকারণকে লুপ্ত করে দেয়, এক অবুঝ আবেগে মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তোলে, বাচাল বা বোবা করে দেয়। হয়তো সেটাই প্রেম। অর্থাৎ যুক্তিশীল নির্বুদ্ধিতা। তাপসী বলল, এঃ মা, আমার হাতুড়িটা বুঝি গেল শেষ হয়ে। লাজুক রুকু বলল, হাতুড়ির কিছু হয়নি।

মেয়েটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে তার পেরেক ঠোকা দেখল। আর তখন আরো বেশিবার আঙুল থেঁতলে যেতে লাগল রুকুর।

তাপসী হাসছিল মাঝে মাঝে। বলল, আমাদের বাড়িতে আর বড় হাতুড়ি নেই।

এতেই হবে। বলল রুকু।

হচ্ছে কোথায়? পেরেকের মাথায় লাগছেই না।

একটু সময় নেবে।

তুমি বুঝি স্নানে যাচ্ছিলে? দেরি হয়ে যাবে না?

আজ ছুটির দিন। দেরি হলে কিছু হবে না।

দেশের বাড়িতে তোমার কে কে আছে?

মা বাবা ভাই বোন।

বোন কজন?

চারজন।

সবাই তোমার ছোটো ? আর ভাই ?

সবাই ছোটো।

তোমার বয়স কত ?

সতেরো হবে বোধহয়।

বোধহয় কেন ? ঠিক জানো না ?

আমি হিসেব রাখি না।

বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগে না ?

আগে লাগত। এখন সয়ে গেছে।

মাসী খুব ভালবাসে বুঝি ?

বাসে।

তোমার ডাকনাম তো রুকু, ভাল নাম কি ?

রুক্মিণীকুমার।

বেশ নাম তো। এরকম নাম আজকাল শোনা যায় না। বলো তো বঙ্কিমের কোন্ উপন্যাসে এই নাম আছে ?

রাধারানী।

ও বাবা, তুমি তো অনেক পড়েছো। মোটেই গাঁইয়া নও।

পাকিস্তানেও আমরা শহরেই থাকি। গাঁয়ে নয়।

কোন্ শহর ?

ময়মনসিং।

কুচবিহারের মতো এমন ভাল শহর ?

এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না, তবে এর চেয়ে অনেক বড়।

আমাদের কুচবিহারের মতো এত ভাল শহর কোথাও নেই, তা জানো ? এত নীট অ্যাণ্ড ক্লীন শহর দেখেছো কখনো ?

এইরকম সব কথা হয়েছিল সেদিন। অনেক কথা। খুব কথ

বলতে ভালবাসত তাপসী। খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে। একই ক্লাসে পড়ত তারা। রুকু জেংকিনস স্কুলে, তাপসী সুনীতি অ্যাকাডেমিতে। স্কুলের সেটা শেষ বছর। তখন উপর্যুপরি ঢেউ আসত। ঢেউয়ে টালমাটাল হয়ে যেত রুকু। একা শুয়ে যখন ভাবত তখন টের পেত তার বুকের মধ্যে কাঁকড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে। তেমনি তীক্ষ্ণ অনুভূতি, জ্বালা। মাঝে মাঝে ধক করে ওঠে বুক আনন্দে। এক-একদিন হোঃ হোঃ খুশির হররায় পাগল হয়ে যায় মাথা।

খুব বেশিদিন নয়। পরিচয় হওয়ার মাত্র দু মাসের মাথায় একটা ভুখা মিছিল বেরোলো শহরে। স্কুল-কলেজে ধর্মঘট। রাজনীতির নেতারা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ফ্ল্যাগ-হাতে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেই মিছিলে। সাগরদীঘির সামনে পুলিশের ব্যারিকেড। মিছিল থামবে কি এগোবে তা কেউ বলে দেয়নি। সুতরাং মিছিল ধীরে ধীরে এগোলো। কী কারণে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল তা কোনোদিনই জানতে পারেনি কেউ সঠিকভাবে। সেই মিছিল এগিয়ে গেলেই বা সরকারের কী ক্ষতি হত? সাগরদীঘির শান্ত, নিরালা রাস্তার ওপর মোট চারজন গুলি খেয়ে মরে গেল। আর কী আশ্চর্য! সেই চারজনের মধ্যে একজন তাপসী।

খবর পেয়ে শহর ভেঙে পড়েছিল সেখানে। পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল রুকুও। দেখল, তাপসীর নতুন যৌবনে ফুটে ওঠা একটি স্তন বিদীর্ণ করে পাঁজর ফাটিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। একটা গুলিতে অত বড় ক্ষত হতে পারে তা জানা ছিল না রুকুর। ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

তাপসী কোনোদিন রাজনীতি করেনি, মিছিল-টিছিলেও যায়নি। সেবার জোর করে স্কুল থেকে কয়েকজন বড় মেয়ে তাদের কয়েক-

জনকে ধরে নিয়ে যায়।

কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তাপসী মরে যাওয়ার পর রুকুর কয়েকদিন কাটল মানসিক অন্ধকারে। ভিতরে একটা দিশেহারা নিরালম্ব ভাব। সেটা কি গভীর শোক? নাকি সেই গুলির ক্ষত দেখে বিস্ময়মিশ্রিত ভয়? আজও ভাবলে হাসি পায়, তাপসীর মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন সে সন্ধ্যের পর একা থাকতে ভয় পেত। মনে হত, তাপসীর ভূত এসে দেখা দেবে। তবে কি করে সে বলবে যে তাপসীর প্রতি তার ভালবাসা ছিল?

মৃত্যুর বেশ কিছুদিন বাদে তাপসীর মা এসে একদিন মাসীর কাছে বলেছিল, আর তো কিছু মনে হয় না, শুধু ভাবি মেয়েটা মরার সময়ে কত না জানি ব্যথা পাচ্ছিল, হয়তো মা বলে ডেকেছিল কতবার। ওই শেষ সময়টায় ওর কাছে তো কেউ ছিল না, কে জানে তখন তেষ্টা পেয়েছিল কি না, খিদে পেয়েছিল কি না!

শুনে ভারি ছিছিক্কার বেজেছিল রুকুর মনে। কই, সে তো কখনো মায়ের মতো তাপসীর মৃত্যুযন্ত্রণার কথা ভাবেনি! ভাবেনি তো, শেষ সময়ে ওর জলতেষ্টা পেয়েছিল কি না! পিচের রাস্তায় এক ভিড় লোকের মধ্যে, জলজ্যান্ত দিনের আলোয় নিজের রক্তে মেখে এক বুক ক্ষতের যন্ত্রণায় হাঁফাতে হাঁফাতে মৃত্যুর মধ্যে একা ডুবে যেতে কেমন লেগেছিল তাপসীর, তা কখনো অনুভব করার চেষ্টাও করেনি রুকু। না করলে ভালবাসা কি করে হল?

বার বার ঘটনাটা ভাঁজে ভাঁজে খুলে ভেবে দেখেছে রুকু। আজও সন্দেহ রয়ে গেছে, তাপসীকে সে ভালবেসেছিল কিনা। মন বলে, বেসেছিল। যুক্তি বলে, না। তাপসী যদি আজও বেঁচে থাকত তবে কী হত? নিশ্চিত বলা যায়, রুকুর সঙ্গে তার বিয়ে হত না।

কারণ রুকুর বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই তাপসীর বিয়ের বয়স হয়ে যেত। তাছাড়া, সমানবয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে বাধা আসত। কে জানে হয়তো তাপসীই রাজি হত না। আর যদি অঘটনক্রমে বিয়ে হতই তবে তাপসীকে আজ কেমন লাগত রুকুর? হয়তো ভাল নয়, হয়তো একঘেয়ে, হয়তো মনকষাকষি। এসবই তো হয়। রুকু জানে।

জুডিসিয়াল এনকোয়ারি বসল ল্যানসডাউন হলে। রোজই সেই শুনানিতে যেত রুকু। বার বার তাপসীর নাম উঠত। রুকুর অল্প-বয়সী মন চাইত, কঠোর প্রতিশোধ। কিন্তু সেই তদন্তে কিছুই হল না, কেউ শাস্তি পেল না। পুলিশের বড় অফিসারকে শুধু বদলি করে দেওয়া হল।

রুকুর জীবনে প্রেম বলতে এটুকুই। এটুকুই সে বহুবার ভেবেছে, বিশ্লেষণ করেছে, গবেষণা করেছে। রুকুর স্মৃতিশক্তি প্রখর বলে কোনো খুঁটিনাটিই সে ভুলে যায় না। আজও তাপসীর সেই সতেরো বছরের চেহারাটা মনে আছে হুবহু। যত কথা হয়েছে তার সঙ্গে সবই প্রায় আজও মুখস্থ আছে রুকুর। আরো দিন গেলে পাছে ভুলে যায় সেই ভয়ে লিখেও রেখেছে একটা পুরোনো ডায়েরিতে। মাঝে মাঝে বের করে পড়ে।

বাইরে এখনো অঝোর বৃষ্টি। আবছা হয়ে এল কলকাতা। কিন্তু আর বসে থাকার মানে হয় না। রুকু উঠল।

॥ দয়ী ॥

আর পাঁচজনের যেমন শান্তশিষ্ট নিরীহ ভদ্রলোক বাবা থাকে, দয়াময়ীর সেরকম নয়। তার বাবা বসন্ত দস্তিদার একসময়ে বাগমারীর একচ্ছত্র গুণ্ডা ছিল। আজও অনেকে বসন্তবাবুকে বে-খেয়ালে বসনগুণ্ডা বলে ফেলে। কিংবা ট্যারা বসন। আটষট্টি-উনসত্তর সাল পর্যন্ত বাগমারী শাসন করেছিল বসন্ত দস্তিদার। তারপর হঠাৎ তার দল ভেঙে সফি আর কালো নামে দুই ভাই আলাদা হয়ে দল করল। দিনরাত দুই পক্ষে বোমবাজি আর লাঠি-ছোরা চলত। বসন্ত দস্তিদার টের পেল, শুধু কালো আর সফিই না, নতুন গোঁফ-ওঠা একদল স্কুল-কলেজের ছোকরাও খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। পুলিশের খাতায় তাদের নাম নেই, কেউ চুরি-ছিনতাই, ওয়াগন ভাঙার মামলাতেও থাকে না। এরা শুধু শ্রেণীশত্রু খতম করতে চায় এবং তাদের লিস্টে বসন্তেরও নাম আছে।

বসন্তের তখন বয়স হয়েছে, টাকাও হয়েছে। ঝুট-ঝামেলায় না থেকে সে টালিগঞ্জের গলফ ক্লাবে একটা পুরোনো বাড়ি কিনে উঠে এল। ভোল পালটে গেল।

বাবার এই পুরো ইতিহাসটাই জানে দয়াময়ী। তার বাবা আজও নিছক ভদ্রলোক নয়। এক সময়ে অসাধারণ সুপুরুষ ছিল, লম্বা জোরালো ফর্সা চেহারা। এখন চেহারায় কিছু মেদসঞ্চার হলেও বসন্ত ইচ্ছে করলে চার-পাঁচ জোয়ানের মোকাবিলা করতে পারে। এখনো সঙ্গে রিভলবার থাকে বাবার মুখ দিয়ে অনর্গল খিস্তি

বেরোয়। রেগে গেলে এখনো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। নিজে গুণ্ডামি না করলেও এই অঞ্চলেও তার একটা দল তৈরি হয়েছে। তাদের দাপট কম নয়। বসন্তের সঙ্গে পুলিশ-দারোগা, এম-এল-এ, মিনিস্টারদের বেশ খাতির। পাঁচ-সাতখানা ট্যাকসি, দুটো মিনিবাস আর গোটা দশেক লরি আছে তার। এখন টাকা রোজগার করাই তার একমাত্র নেশা।

দয়াময়ীরা তিন বোন, দুই ভাই। তিন বোন বড়, ভাইয়েরা ছোটো। বোনদের মধ্যে দয়াময়ী মেজো। বড় মৃন্ময়ী সেই বাগমারীতে থাকতে বয়োধর্মে বাবার দলের এক ছোকরা মস্তানের সঙ্গে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। সাতদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে তারা ধরা পড়ে, বিনা পাশপোর্টে যশোরে যাওয়ার চেষ্টা করায়। তারা জানত এ-দেশে থাকলে বসন্ত গুণ্ডার হাত থেকে রেহাই নেই। রেহাই পায়ওনি শেষ পর্যন্ত। বসন্তই সীমান্ত পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়েছিল দুজনকে। তার কয়েকদিন বাদেই উলটোডিঙির রেললাইনে সেই ছোকরা প্রেমিকের কাটা মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃন্ময়ীর অতীত ইতিহাস চেপে রেখে পরে তার বিয়ে দেওয়া হয় এক ইনজিনিয়ারের সঙ্গে। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়িতে সবই জানাজানি হয়ে যায়। তারা মৃন্ময়ীর ওপর বাইরে থেকে কোনো নির্যাতন করেনি ঠিকই, কিন্তু স্বামী তাঁকে দু-চোখে দেখতে পারে না।

দয়াময়ী জানে, বাবা এখন আর আগের মতো নেই। এখন দয়াময়ী কাউকে বিয়ে করতে চাইলে বাবা আপত্তি করবে না। এখন বসন্ত ছেলেমেয়েদের কোনো ব্যাপারেই বাধা দেয় না। দয়াময়ীরা খুবই স্বাধীন এবং খানিকটা স্বেচ্ছাচারীও। মৃন্ময়ী ছাড়া তারা আর

সব ভাইবোনই পড়াশুনো করেছে ইংরিজি মিডিয়ামের স্কুলে, ভাল কলেজে। তারা চৌখোশ, চালাক, স্বার্থসচেতন। মৃন্ময়ীর মতো ভুল তারা করবে না।

সেই মৃন্ময়ী এখন দাঁড়িয়ে আছে সাততলার ফ্ল্যাটের উত্তর দিকের ব্যালকনিতে। সদর দরজা খোলা। বাচ্চা চাকরটা স্কুল-ফেরত বাবুনকে খেতে দিচ্ছে ডাইনিং টেবিলে। দয়ী ঘরে ঢুকে দৃশ্যটা দেখল। একটা সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটের মধ্যে নিজেকে কী করে আঁটিয়ে নেয় মানুষ কে জানে! দয়ী কোনোদিন কারো ঘরকন্না করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বাবুন মুখ তুলে হাসল, হাই দয়ী আন্টি।

দয়ী চোখ টিপে বলে, হাই।

মৃন্ময়ীর এলোচুলে শুকনো ঝোড়ো বাতাস লাগছে। ভারি আনমনে তাকিয়ে আছে বাইরে। দয়ী নিঃশব্দে গিয়ে পাশে দাঁড়াল। বলল, কী গরম আজ!

মৃন্ময়ী মুখ ফিরিয়ে হাসল, এই এলি? কখন থেকে তোর জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সাততলায় বড্ড বাতাস। দয়ীর গলা আর বুকের ঘামে বাতাস লাগতেই শিরশির করে উঠল গা। বলল, বিশুকে ফ্রিজ থেকে জল দিতে বল তো।

ঠাণ্ডা খাস না। আমি মিশিয়ে দিচ্ছি।

মৃন্ময়ী চলে গেল।

একবার দিদির দিকে ফিরে তাকায় দয়াময়ী। সবই স্বাভাবিক মৃন্ময়ীর। কেউ দেখে বুঝতে পারবে না যে, ওর জীবনে কোনো সুখ নেই।

কিংবা সুখের ধারণা হয়তো দয়াময়ীর ভিন্ন রকমের। কার মনে সুখ আছে, কার মনে দুঃখ তা কে জানে বাবা! তবে মৃন্ময়ী সুখে নেই মনে করে যাওয়া-আসার পথে মাঝে মাঝে চলে আসে দয়াময়ী। এসে দেখতে পায় এই ফ্ল্যাটের ছিমছাম সংসারে অবধারিত এক জেনারেশন গ্যাপ। তার সঙ্গে মৃন্ময়ীর। মৃন্ময়ীর সঙ্গে তার ছেলে বাবুনের। মৃন্ময়ীর কোনো বোধ, ধারণা, বিশ্বাস বা জ্ঞানগম্যির সঙ্গেই মেলে না দয়াময়ীর। তবু তাদের ভাইবোনদের মধ্যে যদি কারো সঙ্গে কিছু ভালবাসা থেকে থাকে দয়ীর তবে তা আছে এই দিদির সঙ্গেই। মৃন্ময়ী তার চেয়ে বছর পাঁচেক বা তারও বেশি বড়। মাঝখানে আরও দুটো বোন হয়েছিল, বাঁচেনি।

মৃন্ময়ী ঠাণ্ডা আর সাদা জল খুব নিপুণভাবে মিশিয়ে এনেছে। কষে একটা পোকা দাঁত আছে দয়ীব। খুব ঠাণ্ডা খেলে চিনচিন ব্যথা করে। এখন সেই ব্যথাটা তেমন হল না। গলা বুক ঠাণ্ডায় জ্বলে গেল না। অথচ ঠাণ্ডা হল। খুব ছোটো ছোটো চুমুকে জলটা খেতে খেতে দয়ী বলে, তুই কী করে যে পারিস!

কী পারি?

বড্ড বাতাস। এত বাতাসে চেঁচিয়ে না বললে কিছু শোনা যায় না। কিন্তু দয়াময়ীর চেঁচাতে ইচ্ছে হল না বলে জবাব দিল না। অদূরের গড়িয়াহাটার দিকে চেয়ে রইল।

মৃন্ময়ী রেলিং দিয়ে ঝুঁকে নীচের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখে বলে, কতক্ষণ ধরে তোর গাড়িটা দেখতে পাব বলে দাঁড়িয়ে আছি। কৈ, দেখতে পেলাম না তো! আজ গাড়ি আনিসনি?

দয়াময়ী তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, ঐ তো; নীল ফিয়াটটা।

রং করালি বুঝি? আগে তো সবুজ ছিল।

দয়াময়ীব মনটা করুণ হয়ে যায়। মৃন্ময়ী যখন যুবতী তখন বসন গুণ্ডার টাকা হয়নি এত। মৃন্ময়ী তাই নিজের গাড়ি চালিয়ে দাবড়ে বেড়ানোর আনন্দ ভোগ করেনি কখনো। যার সঙ্গে বিয়ে হল তার টাকা আছে বটে, ভালবাসা নেই। তবু মৃন্ময়ী কখনো ভাইবোনকে হিংসে করে না; বরং তারা গাড়ি চালায়, বড়লোকের মত থাকে আর স্বাধীনতা ভোগ করে বলে মৃন্ময়ীর একটু গৌরববোধ আছে।

দয়ী কথার জবাব না দিয়ে বলল, তোর অতিথি কখন আসবে?

বিকেলে।

মুর্গী আনিয়ে রেখেছিস?

মাথা নেড়ে মৃন্ময়ী বলে, তোর জামাইবাবু কাল নিউ মার্কেট থেকে এনে রেখেছে। জ্যান্ত। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আমি জ্যান্ত পাখি কাটতে পারি না, বড্ড মায়া হয়। বিশু বলছে সেও পারবে না। তুই কি পারবি?

ভ্রূ কুঁচকে দয়ী বলে, পারব না কেন? আমার অত মায়াদয়া নেই। খেতে যখন পারব তখন কাটবার বেলায় কেন ঘোমটা টানা বাবা, চল দেখি কেমন মুর্গী।

মৃন্ময়ীর পিছু পিছু রান্নাঘরে আসে দয়াময়ী। ধামাটা খুব সাবধানে ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখে। অন্তত গোটা পাঁচেক মুর্গী ছানা কুক কুক করে ওঠে মুক্তির অপেক্ষায়।

দয়াময়ী ধামা ফেলে ওপরে ভারী নোড়া ফের চাপা দিয়ে বলে, এবেলা কী রেঁধেছিস বল তো! বড্ড খিদে পেয়েছে।

কেউ খেতে চাইলে মৃন্ময়ী খুশী হয়। উজ্জ্বল মুখে বলে, চল খাবি। ভাল চিংড়ি আছে। গলদা।

বাবুন ডাইনিং টেবিলে নেই। উঠে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছে উইকলি টেস্টের জন্য তৈরি হতে। দয়াকে ভাত বেড়ে দিতে দিতে মৃন্ময়ী বলে, বাবুনের যে কত পড়া! ছেলেটা নাওয়া খাওয়ার সময় পায় না। আমি বলি একটু বিশ্রাম কর। তা শোনে না।

দয়া তাকাল। মা ছেলের সম্পর্কটা জানে সে। এ বাড়িতে মৃন্ময়ীর কোনো মতামত নেই, কোনো কর্তৃত্ব নেই। বাবুন কখনো মৃন্ময়ীকে পাত্তা দেয় না।

মৃন্ময়ী একটা শ্বাস ফেলে বলে, বাবুন সেই বাবা-ভক্তই হল। আগে ভাবতাম, অন্তত বাবুনটা আমার দিক নেবে। কিন্তু এখন কেমন একটা নতুন হাওয়া এসেছে। বেশির ভাগ বাচ্চা-কাচ্চাই এখন মায়ের চেয়ে বাপের বেশি ভক্ত।

এসব তত্ত্ব জানার ইচ্ছে দয়ার নেই। তাদের বাড়িতে কেউই তেমন বাপ-ভক্ত নয়। একটু ঠাট্টা করার জন্যই দয়াময়ী হঠাৎ বলল, তুইও কি তাই?

আচমকা মৃন্ময়ীর মুখ থেকে রক্তের রং সরে গেল। কিছুটা স্থির হয়ে গেল সে। কোনো জবাব দিল না।

দয়া চোখ সরিয়ে নেয়। এই একটা প্রসঙ্গেই মৃন্ময়ীর যত অস্বাভাবিকতা। আজও বাবার সামনে গেলে বা বাবার প্রসঙ্গ উঠলেও মৃন্ময়ী কেমন একরকম হয়ে যায়। মৃন্ময়ীকে যদি কেউ কখনো বলে, তোমার বাবা তোমাকে এই সাততলার বারান্দা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তে বলেছে, মৃন্ময়ী ঠিক এমনি সাদা মুখে, শুকনো চোখে একবার চারদিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখবে, তারপর নিয়তির নির্দেশে চালিত হওয়ার মতো গিয়ে ঠিক লাফিয়ে পড়বে।

দয়াময়ী গম্ভীর হয়ে গেল। বিরক্তির সঙ্গে বলল, বাবাকে তোর

এত ভয় কেন বল তো! আমরা তো কেউ ভয় পাই না। ইন ফ্যাক্ট বাবাই আমাদের সমীহ করে চলে।

মৃন্ময়ী জবাব না দিয়ে উঠে গেল। রান্নাঘরে খানিকটা সময় কাটিয়ে ফিরে এসে বসল চোরের মতো। খুব চাপা স্বরে ফিস ফিস করার মতো বলল, আমি সবাইকে ভয় পাই। তোর জামাইবাবুকে, বাবুনকে, বাবাকেও।

দয়ী দিদির দিকে চেয়ে দেখল। মনটা রাগ আর বিরক্তিতে ভরা। এই মেয়েটার ওপর সবাই এত নির্যাতন করে কেন? বয়সের দোষে বোকা মৃন্ময়ী যখন ছোকরা গুণ্ডাটার সঙ্গে পালিয়েছিল তখন থেকেই তাব লাগাতার নির্যাতনের শুরু। পালিয়ে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে তারা ভয়ঙ্কর বসন গুণ্ডার হাতে ধরা পড়ার ভয়ে ছায়া দেখেও চমকে উঠত। মরীয়া হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানে। মাফিয়াদের মতোই অমোঘ ট্যারা বসনের দল সেইখানে সীমান্ত পুলিশের হেফাজতে যখন তাদের নাগাল পেল তখনই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মৃন্ময়ী। পরে রেল লাইনের ধারে তার প্রেমিকের কাটা-ছেঁড়া মৃতদেহ তাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ট্যারা বসন। বলেছিল, দেখে রাখ্। ভবিষ্যতে মনে রাখিস। সেই লজ্জা আর ভয় ভুলবার আগেই এক চকচকে ভদ্রঘরে বিয়ে হয়ে গেল মৃন্ময়ীর। যখন পেটে বাবুন এল তখনই একদিন তার স্বামী সরিৎ তার অতীতের সেই লজ্জার কথা জানতে পারে। বসন্ত দস্তিদারের শত্রুর অভাব নেই, তাদেরই কেউ জানিয়েছিল। মৃন্ময়ী ভয়ে লজ্জায় আর-একদফা স্তম্ভিত হয়ে গেল। যেন কেউ তাকে সম্পূর্ণ ন্যাংটো করে ফ্লাড লাইটের সামনে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিছুই গোপন নেই। লজ্জার সেটাই শেষ নয়। সরিৎ রাগে দুঃখে তার সব বন্ধু-বান্ধবদের কাছে,

আত্মীয়দের কাছে বলে দিয়েছিল সেইসব কথা। তারপরও মৃন্ময়ী যে পাগল হয়ে যায়নি সেইটেই যথেষ্ট। আজও মৃন্ময়ী এক অস্বাভাবিক অবস্থায় বড় অনাদরের জীবন যাপন করে যাচ্ছে। অবিরল নিরাবরণ অবস্থায় পাদপ্রদীপের আলোয় দর্শকদের সামনে সে দাঁড়িয়ে। আজ আর লজ্জা নেই, তবে এক হীনমন্যতায় ডুবে সে নিজের সব বোধ হারিয়ে ফেলেছে ক্রমে। বয়ঃসন্ধির সেই বোবা ভয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা, বাবার ভয়ঙ্কর চেহারা আজও তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাকে নিরন্তর লজ্জা ও অনাদরের যন্ত্রণা দেয় তার স্বামী আর ছেলে।

মৃন্ময়ীকে এই গহ্বর থেকে কোনোদিনই বোধহয় আর টেনে তোলা যাবে না।

সেই ঘটনাটার কথা সঙ্কোচবশে কখনো দিদিকে জিজ্ঞেস করেনি দয়ী। তখন দয়ী খুব ছোটো। দিদিকে ফিরিয়ে আনা হল বাড়িতে। দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় একটা তালাদেওয়া ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকত সারা দিন। কাঁদত না, গোঙানোর মতো একরকম বোবা শব্দ করত। সারা গায়ে মারের দাগ। চুল ছেঁড়া, ঠোঁট রক্তাক্ত। বিভীষিকার মতো দিন গেছে সেসব।

আজ দয়ী কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। বলল, দিদি, একটা কথা বলবি? লাটুকে তুই কেমন বাসতিস?

লাটু! লাটুটা আবার কে? মৃন্ময়ী ভারী অবাক হয়।

সেই যে। যার সঙ্গে তুই চলে গিয়েছিলি!

মৃন্ময়ীর বিস্মিত মুখ হঠাৎ-স্মৃতিতে সিঁদুরে হয়ে গেল। দিশেহারার তো চারদিকে একবার তাকাল, বোকার মতো হাসল, শ্বাস ফেলল। তারপর মাথা নীচু করে বলল, খুব তেজী ছিল। বেঁচে থাকলে

বাবাকে হয়ত ও-ই জব্দ করত একদিন।

খুব তেজী?

সাংঘাতিক। বিশ বছরও বয়স হবে না, তার মধ্যেই পাঁচ ছটা খুন করেছিল।

তোর খুনীকে পছন্দ হল কেন?

ঐ বয়সটাই ওরকম। মনে করতাম, খুনটা খুব বাহাদুরীর কাজ।

তাকে খুব ভালবাসতিস?

আমি? বলে চমকে ওঠে মৃন্ময়ী। ভয় পেয়ে মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বলে, আমি নয়। ওই তো আমাকে সব বলত। বিয়ে করি চলো, বসনদাকে বলি চলো।

তুই কিছু বলিসনি?

আমি বারণ করতাম। জানি তো, শুনতে পেলে বাবা মেরে ফেলবে।

তারপর?

কিন্তু ও খুব তেজী ছিল। ভীষণ সাহস। বলত, বসনদা রাজি না-হলেও কুছ পরোয়া নেই। চলো, ভাগব। সেই সাহস দেখেই আমি কেমন যেন সাহসী হয়েছিলাম। পালিয়ে গিয়ে কিন্তু বুঝেছিলাম, বাবার হাত থেকে বাঁচব না। সব জায়গায় বাবার লোক। ও আমাকে কালীঘাটে নিয়ে যায় বিয়ে করবে বলে। বাবা তো ভীষণ বুদ্ধিমান। বাবা ঠিক জানত আমরা কালীঘাটে যাব। সেখানে নারায়ণ নামে বাবার একজন লোক আমাদের ধরে। ট্যাক্সি করে যখন আমাদের বাগমারী নিয়ে যাচ্ছিল তখন মানিকতলা ব্রীজ পেরিয়ে নির্জন একটা রাস্তায় লাটু নারায়ণদাকে মারল। ট্যাকসির মধ্যে। অনেকক্ষণ ধরে তক্কে তক্কে ছিল। কিন্তু নারায়ণদাও তে

কম নয়। সেই সময়টা সামনে ঝুঁকে ট্যাকসির ড্রাইভারকে রাস্তা চেনাচ্ছিল, লাটু আচমকা পিঠে ছোরা ঢুকিয়ে দিল। আমার কোল ভরে গেল রক্তে। দু হাতে রক্ত। কী গরম! লাটু একটুও ঘাবড়ায়নি। নারায়ণদার লাশ রাস্তায় ফেলে দিয়ে সেই ট্যাকসি করেই আমরা পালাই। একটা বস্তিতে দুদিন, কসবায় এক রাত্রি, এক বন্ধুর বাড়িতে এক রাত্রি কাটে। স্ট্র্যাণ্ড রোডে মস্ত মস্ত যেসব কংক্রীটের পাইপ আছে, তার মধ্যেও ভিখিরিদের সঙ্গে এক রাত্রি কাটিয়েছি। বাবা তখন তুলকালাম করছে আমাদের খোঁজে। লাটু কখনো ভয় পেত না তাতে। তাই খুব সাহস পেতাম। লাটু যেরকম ছিল সেরকমটা এখন দেখি না।

তার মানে তুই লাটুকে ভালবাসতিস দিদি।

না না! আর্তস্বরে বলে ওঠে মৃন্ময়ী। তারপরই নিজের গলার স্বরে চমকে ওঠে। চারদিকে চায়।

মৃন্ময়ীর স্বরটা কিছু ওপরে উঠেছিল। কাশ্মীরী কাঠের নকশা করা পারটিশনের ওপাশ থেকে বাবুন মুখ বাড়িয়ে বিরক্ত গলায় বলে, দয়ী আন্টি, হোয়াট ইজ গোয়িং অন? এনিথিং রং?

নাথিং ডার্লিং! দয়ী বিস্ময়ের ভান করে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে, জাস্ট টকিং ওভার সাম ফানি থিংস।

মৃণ্ময়ী বাবুনের দিকে চেয়েছিল। ভয়ে সম্মোহিত তার দৃষ্টি।

বাবুন টেবিল থেকে একটা চিংড়িমাছ তুলে নিয়ে চলে যায়। দয়ী সামান্য খেয়ে উঠে পড়ে। কাজ আছে।

জওহরলাল নেহরু চিকেন রয়্যাল খেতেন। রান্নাটা কলেজের এক বান্ধবীর কাছে শিখেছিল দয়ী। মাঝে মাঝে রাঁধে। পরশুদিন

মৃন্ময়ী টেলিফোন করেছিল। তার কোন এক মাসতুতো না পিসতুতো দেওর বারো বছর ফিলাডেলফিয়ায় থেকে সত্য এসেছে। মাত্র পাঁচ মাসের ছুটি তার। এর মধ্যেই সে পাত্রী দেখে পছন্দ করে বিয়ে সেরে বউ নিয়ে আবার ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে যাবে। আত্মীয়স্বজনরা তাকে নেমন্তন্ন করে আইবুড়ো ভাত খাওয়াচ্ছে খুব।

মৃন্ময়ী ফোনে বলেছিল, তোর সেই চিকেন রয়্যাল ওকে খাওয়াতে চাই।

দয়ী বলল, ওসব করতে যাবি কেন? বিদেশে ওরা ওসব কত খায়। তুই বরং শুকতো মাছের ঝোল দিয়ে খাওয়াস।

মৃন্ময়ী তাতে রাজি নয়। বলল, তা হয় না। তোকে আসতেই হবে। চিকেনও রাঁধতে হবে।

কেন? আমাকে আসতেই হবে কেন?

সব কথার অত খতেন নিস কেন? বলছি আসবি।

মনে মনে হেসেছিল দয়ী। মৃন্ময়ীর দেওরভায়া পাত্রী দেখতে অ্যামেরিকা থেকে এতদূর এসেছে সেটা সে ভুলে যায়নি। তবে দয়ীর একবার পরীক্ষাটা দিতে আপত্তি নেই। যদি লোকটাকে তার পছন্দ হয় এবং তাকেও লোকটার, তবে ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে ঘরসংসার করতে দোষ কি? শুনেছে লোকটা সেখানে বহু টাকা রোজগার করে, একটা বাড়ি আর দু দুটো গাড়ি আছে। দোষের মধ্যে বয়সটা ছত্রিশ সাঁইত্রিশ। হিসেবে দয়ীর চেয়ে দশ এগারো বছরের বড়। তা হোক।

খেয়ে উঠে দয়ী আঁচল কোমরে বেঁধে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে মুর্গী কাটতে বসল। সঙ্গে বাবুন। বাইরে থেকে মৃন্ময়ী দরজায় টোকা দিয়ে বলে, এগুলোকে বেশি কষ্ট দিস না দয়ী। টপ করে

কেটে ফ্যাল।

একটা মস্ত ভোজালী হাতে বাবুন পাশেই দাঁড়িয়ে খুব তড়পাচ্ছিল, আই অলসো ক্যান ডু ইট আন্টি। গিভ মি ওয়ান।

বাবুন ভুল করে ধামা তুলতেই মুর্গীর ছানাগুলো কুক-কুক করে ডাকতে ডাকতে উল্টোপাল্টা দৌড় লাগাল উর্ধ্বশ্বাসে। কিন্তু বন্ধ ঘর থেকে পালানোর পথ না পেয়ে দেয়ালে দরজায় গ্যাস সিলিণ্ডারে ধাক্কা খেয়ে ছটফটিয়ে ঘুরছে; একটাকে ধরে ফেলেছিল দয়ী। মস্ত ধারালো বঁটিতে গলাটা চোখের পলকে ছিন্ন করে দিল সে। টিপে ধরে রইল নলি, যাতে খুব বেশি রক্ত না পড়ে। তবু পড়ল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ছড়িয়ে পড়ল সাদা মেঝেয়।

বাবুনের মুখ সাদা হয়ে গেছে দৃশ্যটা দেখে। তবু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে বলল, ইউ আর এ ব্র্যাণ্ডেড কাটথ্রোট দয়ী আন্টি!

রিয়েলি? বলে দয়ী ভ্রূ তুলে হাসে। তারপর বলে, তুই বোকার মতো ধামাটা হড়াস করে তুলে ফেললি কেন রে? আমি হাত ঢুকিয়ে একটা একটা করে ধরে বের করতাম। নাউ হেলপ মি টু ক্যাচ দেম।

ঝটাপটি করে দুজনে মিলে আরও পাঁচটা মুর্গী ধরল। ভীষণ চেঁচাচ্ছিল মুর্গীগুলো। চোখের সামনে বন্ধুদের রক্তমাখা লাশ দেখে কিছু বুঝে নিয়েছিল তারা। ছ' নম্বরটায় সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ ছিল। একটা তাকের ওপর উঠে বসেছিল সেটা। বাবুন আলু ছুঁড়ে সেটাকে ওড়াল তো বসল গিয়ে আলোর শেডের ওপর। আলু ছুঁড়তে গিয়ে বালবটা ভাঙল বাবুন। কাচে হাত কাটল দয়ী। ঘেমে চুমে একাকার হল। মুর্গীটা কোঁক-কোঁক করে আতঙ্কিত চিৎকারে ঘর ভরে দিল, তারপর প্রাণভয়ে ঘুরতে লাগল চারপাশে।

বাবুন ফ্যাকাসে মুখে বলে, লিভ ইট আন্টি। লেট ইট গো।

দয়ী বলে, লাভ নেই রে বাবুন। আমরা ছেড়ে দিলেও আর কো ধরে খাবে। কিপটে বাপের পয়সা নষ্ট করবি কেন? আয় ধরে ফেলি।

ড্যাড ইজ নো মাইজার। বাবুন বলে।

হি ইজ। বলে একটা জলচৌকির ওপর উঠে খুব সাবধানে কাপ প্লেটের র‍্যাকের ওপর বসে থাকা মুর্গীটার দিকে হাত বাড়ায় দয়ী।

পিছন থেকে বাবুন মৃদু স্বরে বলে, ইউ হ্যাভ এ নাইস ফিগার আন্টি। থার্টি সিকস টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিকস।

হাসতে গিয়ে মুর্গীটা উড়ে পালাল। দয়ী বলে, খুব পাকা হয়েছিস বাবুন। স্কুলে এসব শেখাচ্ছে বুঝি!

সিওর। উই ইভন ডেট দি গার্লস।

মাই গড!

মুর্গীটা গ্যাস সিলিণ্ডারের পিছনে লুকোতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ল। নড়তে পারল না। দয়ী হাত বাড়িয়ে ঠ্যাং ধরে টেনে আনল সেটাকে। বলল, আমরা যখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তাম তখন এত পাকা ছিলাম না।

আই নো ইউ হ্যাড এ বানচ অফ লাভারস।

মারব থাপ্পড়। বলে হাসিমুখেই দয়ী মুর্গীটার গলা নামিয়ে দিল

কাট থ্রোট। বাবুন বলে।

দরজায় টোকা দিয়ে মৃন্ময়ী সভয়ে বলে, কী করছিস তোরা ভিতরে? কী ভাঙলি ও বাবুন? মুর্গীগুলো অমন চেঁচাচ্ছিল কেন রে? আমি বাথরুমে পর্যন্ত থাকতে পারছিলাম না চেঁচানিতে।

বাবুন মৃদুস্বরে বলে, শী ইজ এ মেন্টাল কেস।

দয়ী বলে, ওরকম বলতে নেই বাবুন।

শী হ্যাড অলসো এ লাভার ইউ নো। এ ব্যাড গাই।

দয়ী স্তম্ভিত হয়ে যায়। জামাইবাবু কি ছেলের কাছেও মৃন্ময়ীর অতীত ঘটনা খুলে বলেছে! লজ্জায় লাল হয়ে গেল সে। কঠিন চোখে বাবুনের দিকে চেয়ে বলে, হু টোল্ড ইউ?

বাবুন চাউনী দেখে একটু ভয় পেয়ে অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলে, আই নো। এভরিওয়ান নোজ।

দয়ী বন্ধ দরজা খুলে দিয়ে বলল, আয় দিদি, হয়ে গেছে।

মৃন্ময়ী দরজার কাছ থেকেই দৃশ্যটা দেখে শিউরে ওঠে। ভাঙা ডানা, ছেঁড়া পালক, রক্ত মাখামাখি। দুটো বিচ্ছিন্ন মাথা গড়াগড়ি যাচ্ছে একধারে, অন্য ধারে স্তূপাকার মুর্গীর শবদেহ। মৃন্ময়ী বলল, আহা রে! কষ্ট দিসনি তো ওগুলোকে দয়ী?

কষ্ট কি? মরে বেঁচেছে।

বাবুন তার ছুরি বন্ধ করে পড়ার টেবিলে ফিরে গেছে।

দয়ী মুর্গীর পালক ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, বাবুনটাকে তোরা কি শাসন করিস না দিদি? ও কীসব যেন বলছিল!

মৃন্ময়ী তার ভেজা এলো চুলে গামছার ঝটকা দিচ্ছিল দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে। থেমে গিয়ে বলল, কী বলছিল?

তোর লাভারের কথা।

মৃন্ময়ী উদাস মুখে বলে, সবাই বলে, ও-ই বা বলবে না কেন?

দয়াময়ী মুখ তুলে কঠিন স্বরে বলে, না, বলবে না। বললে ওর মুখ থেঁতো করে দিবি। তোর ভয় কিসের?

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বলে, পেটে ধরলে তো হয় না, বাবুন তো আমার নয়। ওর বাবার।

দয়ী কথা বাড়ায় না। অনেক কাজ।

বিকেল হয়ে আসতে না আসতেই মৃন্ময়ী তাড়া দেয়, রান্না তাড়াতাড়ি শেষ কর। হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আয়। আমি শাড়ি বের করে রেখেছি।

আমি সাজব না দিদি। রান্না করতে ডেকেছিলি, করে দিয়ে গেলাম।

শুধু তাই বুঝি? বোকা কোথাকার! মৃন্ময়ী খুব ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলে, কত ভাল ছেলে জানিস না তো! এরকম আর কপালে জুটবে না।

জুটে দরকার নেই। বলে বটে দয়ী, আবার সাজেও।

বেলা থাকতেই সরিৎ অফিস থেকে ফিরল। মোটা-সোটা নাড়ু-গোপালের মতো চেহারা, কিন্তু কঠিন এক বোকা ব্যক্তিত্ব। দেখলেই মনে হয় এ লোকটা তেমন বুদ্ধিমান নয়, তবে জেদী এবং গোঁয়ার। সব সময়ে মুখে একটা অহংকারী গম্ভীর ভাব। হাসি ঠাট্টা করে না, গল্প জমাতে বা আড্ডা মারতে ভালবাসে না, গান গায় না, বই পড়ে না। তার সব মনোযোগ ছেলের ওপর। অফিস থেকে ফিরে হাত-মুখ ধোয়ার আগেই ছেলের পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে, সেদিনকার স্কুলের পড়া দেখে। বিকেল হলে ছেলেকে খেলতে নিয়ে যায় পার্কে। রাত্রিবেলা ফের ছেলেকে পড়াতে বসে। এ জীবনে আর কোনো আনন্দ বা অবকাশের তোয়াক্কা করে না। মৃন্ময়ীর সঙ্গে কদাচিৎ কেউ তাকে কথা বলতে শুনেছে। তবে এও সত্য যে, মৃন্ময়ী সম্পর্কে নোংরা কৌতূহলেরও তার অভাব নেই। এখনো সে মৃন্ময়ী সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়, অতীতের আরো কোন গুপ্ত ইতিহাস আছে কি না জানার

চেষ্টা করে। লোকটাকে আদপেই পছন্দ করে না দয়ী।

সরিৎ ঘরে ঢুকে তোম্বা মুখ করে অবজ্ঞার চোখে একবার দয়ীকে দেখে বলে, কখন এলে ?

দয়ী বলল, অনেকক্ষণ।

ভাল। বলে সরিৎ শোওয়ার ঘরে চলে গেল।

সবিতের চলে যাওয়ার দিকে একরকম ঘৃণা ও আক্রোশভরা চোখে চেয়ে রইল দয়ী।

॥ সরিৎ ॥

বাবুন আজকাল স্কুলের সাপ্তাহিক পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করছে। খাতায় কোনোখানে একটুও দাগ পড়ে না। তার স্কুলটি খুবই ভাল, কলকাতার একেবারে শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলির একটি। সেখানে ছেলে ভর্তি করতে লোককে মাথা কুটতে হয়। সেখানকার বেশির ভাগ ছেলেই ব্রিলিয়াণ্ট। তাদের মধ্যেও বাবুন আলাদা রকমের ব্রিলিয়াণ্ট। স্কুলের কর্তৃপক্ষ তার দিকে বিশেষ নজর রাখছে। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সে কোনো দারুন ঘটনা ঘটাতে পারে।

সরিৎ খুব মন দিয়ে বাবুনের স্কুলের খাতাপত্র দেখল। দু-একটা প্রশ্ন করল। ছেলের সঙ্গে সে কখনো বাংলোয় কথা বলে না। বাপ আর ছেলে কেবল ইংরিজিতেই বাক্যালাপ করে। তাতে অভ্যাস ভাল থাকে। তা বলে বাবুন বাংলায় কাঁচা নয়। খাতা দেখে গভীর তৃপ্তির একটা শ্বাস ফেলে বাবুনের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইল। তখন বাবুন আস্তে করে ইংরিজিতে বলল, আজ মা কাঁদছিল দয়ী

আন্টির কাছে।

সরিৎ খুব নীচু গম্ভীর গলায় বলল, কেন ?

ঠিক শুনতে পাইনি। বোধহয় বলছিল সবাইকে সে ভয় পায়।

সেটাই পাওয়া উচিত।

দয়ী আন্টি মায়ের পক্ষে।

আমি জানি।

আন্টি বলছিল আমাকে নাকি মারা উচিত।

সাহস থাকে তো মারুক না। বাড়ি থেকে দুজনকেই বের করে দেবো। সরিৎ রাগে ফুঁসে ওঠে। সমস্ত শরীর জ্বলে যায় তার। এত সাহস কোত্থেকে পায় এরা ? এরা তো কোনো দিক দিয়েই তার বা বাবুনের সমকক্ষ নয়। মার্কামারা গুণ্ডার মেয়ে। একটা এক মস্তানের সঙ্গে ভেগেছিল, অন্যটা পুরুষ নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। দয়ীর ইতিহাস বেশ কিছুটা জানে সরিৎ। ওদের পাড়ার একটা ছেলে সরিতের ডিপার্টমেণ্টে জুনিয়ার ইনজিনিয়ার। মাঝে মাঝে সে অনেক খবর দেয়। আগে ভয়ে মুখ খুলত না। কিন্তু তার ভয় ভেঙে দিয়ে মুখ খুলিয়েছে সরিৎই।

গা গরম হয়ে আছে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, তার ওপর রাগ। সরিৎ বাথরুমে আজ অনেকক্ষণ শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান করল। স্নান করতে করতেই ক্ষীণ কলিং বেলের আওয়াজ পেল। বিনয় এল বুঝি !

দয়ীকে আজ এ বাড়িতে ডেকে পাঠানোর মূলে যে একটা ষড়যন্ত্র আছে তা সরিৎ আন্দাজ করেছে। পরশু মৃন্ময়ী যখন টেলিফোন করছিল দয়ীকে তখন বাবুন সবটা শোনে এবং পরে বাবাকে বলে দেয়।

তখনই সরিৎ বলেছিল, চিকেন রয়্যাল মাই ফুট। দে হ্যাভ াদার মোটিভস।

এমনকি বিনয়কে নেমন্তন্ন করার ইচ্ছেও সরিতের ছিল না। া সামাজিক ভদ্রতা সৌজন্যর ধার ধারে না। বরং বাইরের কোনো াাক বাড়িতে এলে সে বিরক্তি আর অস্বস্তি বোধ করে। সে চায় ম্পূর্ণ নির্বিঘ্নভাবে থাকতে। এই উটকো ঝামেলা জুটিয়েছে মৃন্ময়ী। কদিন বলল, বিনয়কে আমাদেরও নেমন্তন্ন করা উচিত। প্রেস্টিজের াাপার।

মৃন্ময়ী সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়। তবে আকাশ াতাসকে উদ্দেশ্য করে যা বলার বলে।

শুনে প্রথমে পাত্তা দেয়নি সরিৎ। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছে, ান্ময়ী কিছু অন্যায় বলেনি। বিনয় মৃন্ময়ীর জন্য দামী সিনথেটিক াাড়ি আর সেন্ট এনেছে অ্যামেরিকা থেকে, বাবুনকে ভিউ মাস্টার াার সরিৎকে স্যুটের কাপড় দিয়েছে। বিনয় তার পিসতুতো ভাই ালেও তাদের পরিবারেরই মানুষ। পিসিমা ছেলে নিয়ে অল্প বয়সে বধবা, বাবা তাকে নিজের পরিবারে এনে রাখেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতা-াশে বিনয় এটুকু দিতেও পারে। কিন্তু সরিৎ আর একটা কথাও ভেবেছে। তার ইচ্ছে স্কুলের পড়া শেষ করেই বাবুনকে বিদেশ াাঠিয়ে দেবে। বিনয়ের সঙ্গে একটা এ ধরনের কথাও হয়েছে। সুতরাং বিনয়কে একদিন নেমন্তন্ন খাওয়ালে মন্দ হয় না। বাবুন ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কিছুর ওপর তার তেমন আকর্ষণ নেই। তার যা কিছু স্বার্থ তা বাবুনকে ঘিরে। বাবুনের জন্য সে সব কিছু করতে পারে।

আর একটুক্ষণ জলের ধারার নীচে দাঁড়ালে ভাল লাগত। কিন্তু

দেরী করতে মন সরল না। ওদিকে এতক্ষণে বিনয়ের সঙ্গে দয়ী পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই মৃন্ময়ী। কিছু বলা যায় না, এলেমদা মেয়ে দয়ী হয়তো প্রথম দর্শনটাই কাজে লাগিয়ে দেবে। ব্যাপারটা বাধা দেওয়া খুবই জরুরী। মৃন্ময়ীর বাড়ি থেকে কোনো মেয়েই আ তাদের বাড়ির বউ করে আনা ঠিক নয়।

পাজামা পাঞ্জাবি পরে সরিৎ বাইরের ঘরে এসে একটু অবা হয়। বিনয় সোফায় বসে কেবল মৃন্ময়ীর সঙ্গে কথা বলছে। দ কাছে-পিঠে নেই।

বিনয় তার বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলে তুমি তো এমনিতে স্মোক করো না। এটা একটা খেয়ে দেখবে নাকি নরম টোব্যাকো।

খুব শখ হলে এক আধটা কখনো-সখনো খায় সরিৎ। তা ধোঁয়াটা কখনো গেলে না। তাছাড়া ছেলের সামনে সিগারে খাওয়ার ব্যাপারে তার ভারী সঙ্কোচ। তবু আজ একটা ধরাল বলল, পাত্রী পছন্দ করেছিস ?

কই পাত্রী ? কত দেখলাম।

একজনও পাশমার্ক পেল না ?

খুঁজে দাও না। আমার তো বেশি সময়ও নেই।

মৃন্ময়ী সরিতের সামনে খুবই অপ্রতিভভাবে বসে ছিল। হঠা বলল, পাত্রী ঠিক পাবে। চিন্তা কোরো না।

হাতে আছে নাকি ? বিনয় জিজ্ঞেস করে ; তারপর বলে, রো দু-দশটা করে চুল পেকে উঠছে। থাকলে আর বেশি দেরি করো ন বৌদি। এটাই ইণ্ডিয়ান মেয়েদের শেষ চান্স। এখানে পছন্দমতো ন পেলে ফিরে গিয়ে একজন অ্যামেরিকানকেই বিয়ে করব।

না না! খুব সিরিয়াস গলায় প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে মৃন্ময়ী। তারপর সরল মনে বলে দেয়, আমার মেজো বোনকে দেখে যাও। খারাপ লাগবে না।

কই সে? জিজ্ঞেস করে বিনয়।

আছে। আজ ওর হাতের রান্নাই তো খাবে।

বিনয় অবাক হয় না। বোধহয় নিমন্ত্রণের ছলে এরকম আরো বেশ কয়েকবার তাকে পাত্রী দেখতে হয়েছে। দুটো পা সামনে টান করে মেলে দিয়ে পিছনে হেলে বসে বলে, যাক বাবা, বাঁচা গেল। তোমার বোন তো, সে নিশ্চয়ই তোমার মতো ভালো স্বভাবের হবে। না দেখেই ফিফটি পারসেণ্ট পছন্দ করছি। এবার ডাকো।

চা নিয়ে আসছে। এই দয়ী! বলে ডাক দিয়ে উঠে যায় মৃন্ময়ী।

বিশ বাইশ বছর বয়সে অনেক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে প্রথম জার্মানীতে গিয়েছিল বিনয়। দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ শিখেছে সেখানে। তারপর সুযোগ বুঝে চলে গেছে অ্যামেরিকায়। সাত ঘাটের জল খেয়ে এখন সে প্রবল প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত। মেদহীন রুক্ষ চেহারা, চালচলনে খুব চটপটে, প্রচণ্ড সময়নিষ্ঠ, সরল ও সৎ। জীবনে কোনো কাজে ফাঁকি দেয়নি বিনয়। মস্ত কোনো ডিগ্রি নেই, কিন্তু হাতে-কলমে কাজ করার মহার্ঘ্যতম অভিজ্ঞতা আছে। বরিৎ নিজে ইনজিনিয়ার, সে অভিজ্ঞতার মূল্য বোঝে। সাহেবরা আরও বোঝে। এই খাঁটি ছেলেটির গলায় দয়ীকে ঝুলিয়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ বেলা এমনিতেই সহজে ফুরোতে চায় না, তার ওপর দোতলায় যেন আরো কিছুক্ষণ আলোর রেশ থেকে যায়। সাড়ে ছটা বেজে যাওয়ার পরও ঘরের আলো জ্বালবার তেমন দরকার পড়ছে না।

কিন্তু মৃন্ময়ী আলো জ্বালল। দপদপ করে লাফিয়ে জ্বলে ওঠে ছু ছুটে স্টিক লাইট আর একটা একশ পাওয়ারের বাল্‌ব।

অপ্রতিভ হাসিমুখে মৃন্ময়ী বলে, এই আমার বোন দয়াময়ী।

ট্রে হাতে দয়াময়ী এগিয়ে আসে লঘু পায়ে। খুব যে সেজেছে তা নয়। চালাক মেয়ে, সাজতে জানে। হালকার ওপর প্রসাধনের সামান্যতম প্রলেপ দিয়েছে মাত্র। পরনে তাঁতের সাদা খোলের শাড়ি। কিন্তু শাড়িটার নকশাওয়ালা পাড় এতই চওড়া যে জমি প্রায় ছাড়ই পায়নি। তাছাড়া আছে সুন্দর মস্ত মস্ত বুটির কাজ। ব্লাউজটা খুবই তুচ্ছ একটা ন্যাকড়া মাত্র। এত ছড়িয়ে কাটা যে পুরো কাঁধ, পিঠ এবং স্তনের ঢেউ পর্যন্ত অনেকখানি দেখা যায়। আদুর রয়েছে পেটের অনেকটা অংশ। দেখে চোখ সরিয়ে নেয় সরিৎ। সিগারেটে মৃদু টান দেয় এবং আনাড়ীর মতো ধোঁয়া ছাড়ে।

দয়াময়ীকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল বিনয়। দুহাত জড়ো করে খুব গভীর আন্তরিকতায় ভরা নমস্কার জানিয়ে বলে, ভারী খুশি হলাম পরিচয় হয়ে।

দয়ী খুব চমৎকার একটা স্মার্ট হাসি হেসে বলে, ওটা তো গ্ল্যাড টু মিট ইউ-এর অনুবাদ। আমাকে দেখে খুশি হওয়ার কিচ্ছু নেই আমি একদম খারাপ। জামাইবাবুর কাছে হয়তো আমার অনেক নিন্দে শুনবেন।

কথাটা বলে একঝলক তাকায় দয়ী। সেই দৃষ্টিটা বুলেটের মতো লাগে সরিতের বুকে। এটা কি দয়ীর খোলাখুলি চ্যালেনজ? খুবই চালাক মেয়ে। মৃন্ময়ীর মতো বোকা আর সরল নয়। ও আঁচ করে নিয়েছে, জামাইবাবু এ বিয়ে আটকানোর চেষ্টা করবে।

বিনয় মৃদু হাসছিল। বলল, বুধোদার মুখে বড় একটা নিন্দে

শুনিনি কারো। তাছাড়া আপনি তো অনিন্দ্য।

সরিতের ভিতরে মৃদু দহন শুরু হয়। খুব ধীরে ধীরে জেগে ওঠে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা। খুব আনাড়ির মতো আর একবার ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে করেই বলে, আমিও তো তাই বলি। ওর নিন্দে করবে কে? দয়ীর কতো অ্যাডমায়ারার!

বিনয় হাসিমুখে দয়ীকে বলে, আপনার অ্যাডমায়ারারদের লিস্টে আজ থেকে আমাকেও ধরে রাখুন।

সরিৎ চায়ে চুমুক দিতে দিতে স্ট্র্যাটিজিটা ভেবে নিল। তারপর আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলল, দয়ীর অ্যাডমায়ারারদের মধ্যে হাজার রকমের ভ্যারাইটিও আছে। প্রায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। ছাত্র, অধ্যাপক, রাজনীতির মস্তান, পাড়ার গুণ্ডা, বুড়ো কামুক, কে নয়? ও প্রায় কাউকেই হতাশ করে না।

বলে কথাটার প্রতিক্রিয়া দয়ীর মুখে খুঁজে দেখে সরিৎ। দয়ী তার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাতে ভয় নেই, অপ্রতিভতা নেই, আছে ভীষণ রকমের একটা ঘেন্না। সরিৎ আপনমনে হাসল। খুশি হল সে। এরকমটাই সে চায়।

ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তির হাওয়া বইছে। বিনয় যতদূর সম্ভব নির্বিকার মুখে আস্তে করে বলে, বাবুনকে দেখছি না।

ডাইনিং টেবিলের পাশে কাঠের পর্দাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মৃন্ময়ী। প্রবল হতাশায় নীচের ঠোঁট ওপরের দাঁতে কামড়ে ধরছে মাঝে মাঝে। সে আজকাল রাগ করতে ভয় পায়। তার আছে কেবল হতাশা।

দয়ী সবশেষে নিজের কাপে চা ছেঁকে নিচ্ছিল মাথা নীচু করে। বিনয়ের কথার জবাবে বলল, বাবুন বোধ হয় ছাদে। দাঁড়ান,

ডেকে আনছি।

তার দরকার কি? খেলছে খেলুক। চলুন বরং আমরাই একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি। গরমে বসতে ইচ্ছে করছে না এখানে। বলে বিনয় একটু নড়ে বসে।

এই কথায় সরিৎ নিজের ভিতরে একটা পরাজয় টের পায়। ওরা ছাদে যাবে? তার মানে তো অনেকখানি। সে একবার দয়ীর দিকে তাকায়। দয়ীও ঠোঁটে ধরে থাকা পেয়ালার কানার ওপর দিয়ে একঝলক তাকায় সরিতের দিকে। সেই চোখে জয়ের ঝিকিমিকি।

যেন কিছুই ঘটেনি এমন শান্তস্বরে সরিৎ বলল, দয়ী, তোমার সেই অ্যাডমায়ারারটির কী যেন নাম! মলয় না? ওঃ বিনয়, সে ছেলেটা দয়ীর জন্য যা পাগল না! যে কাউকে খুন করতে পারে ছোকরা ছেলেটা কিলার টাইপেরই। নকশাল ছিল। ছোকরার দোষও নেই দয়ীর সঙ্গে নাকি ডাকবাংলো-টাংলোয় রাতটাতও কাটিয়েছে। কাজেই এখন তার অধিকারবোধ জন্মেছে।

সিনেমা থিয়েটারে যেমন ফ্রিজ শট বা দৃশ্যের চলন হয়েছে আজকাল, সরিৎ লক্ষ্য করল, ঘরের তিনটে প্রাণী তেমনি নিথর শিলীভূত হয়ে গেল।

সেই অনড় দৃশ্যের মধ্যে প্রথম নড়ল বিনয়। আস্তে করে বলল, বুধোদা ইউ শুড নট···

কথাটা শেষ করল না বিনয়। সরিৎ আর একটা সিগারেট ধরায়। তারপর বলে, আমি জাস্ট সিচুয়েশনটা জানিয়ে রাখছি। আমি কিছু ভুল বলিনি তো দয়ী? বলে সরিৎ দয়ীর দিকে তাকায়।

দয়ীর হাত সামান্য কাঁপছে। চলকাচ্ছে কাপের চা। বুদ্ধিমতী দয়ী কাপটা রেখে দিল টি-পয়ে।

তারপরই হঠাৎ হাসিমুখ তুলে বিনয়কে বলল, ছাদে যাওয়ার কথা ছিল যে! যাবেন না?

বিনয় খেয়ে পেয়ে উঠে পড়ে। বলে, নিশ্চয়ই।

দয়ী চিমটি কাটা হাসি হেসে বলে, এ ঘরটা বড্ডই গরম।

দুজনে প্রায় ঘরবন্দী পাখির মতো হঠাৎ একটু ফোকর পেয়ে প্রাণপণ পাখা ঝাপটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সরিৎ জানে, আজ রাতে দয়ী কাঁদবে। মেয়েরা অপমানিত হলে কাঁদে, দোষ ধরা পড়লে কাঁদে। ও কাঁদবে।

সরিৎ তৃপ্ত মনে চায়ের তলানী শেষ করে পট থেকে আরো এক কাপ ঢেলে নেয়। চা-টা এবার ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, কিন্তু লিকার আরো গাঢ়, চনমনে।

ঘরে যে আর কেউ আছে তা গ্রাহ্যই করেনি সে। কিন্তু না থেকেও মৃন্ময়ী আজ ছিল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বলল, দয়ীর অত খবর তুমি জানলে কি করে?

সরিৎ তার স্ত্রীর দিকে পারতপক্ষে তাকায় না। তার সামনেই বিশাল দেওয়ালজোড়া দরজাটা খোলা। বাইরে আকাশে তখনো খানিকটা পাঁশুটে আলো। সে তাই দেখছিল। চোখ না ফিরিয়েই বলল, প্রমাণ আছে।

মৃন্ময়ী অবাক হয়ে বলে, কিসের প্রমাণ? দয়ী আমার মতো নয়।

তোমরা সবাই সমান। এখন বেশি কথা বোলো না, আমার ভাল লাগছে না।

মৃন্ময়ী হয়তো ভয় পেল, তবু আজ ছাড়ল না। দয়ীর পরিত্যক্ত সোফায় বসে বলে, বিয়েটা তো ভেঙেই দিলে, তাহলে আর বলতে দোষ কি?

সরিৎ বহুকাল বাদে মৃন্ময়ীর দিকে একবার তাকায়। পরমুহূর্তেই ফিরিয়ে নেয় চোখ। আজকাল তার কী যে হয়েছে, কারো চোখেই দু দণ্ড চোখ রাখতে পারে না। আপনা থেকেই চোখ ফিরে আসে সরিৎ অন্যদিকে তাকিয়ে টবের মানিপ্ল্যান্ট দেখতে দেখতে বলে, মলয়ের লেখা একটা চিঠি আমার হাতে এসেছে।

মৃন্ময়ী বলল, কী করে এল?

তাতে তোমার দরকার কী? এসেছে যেভাবেই হোক।

মৃন্ময়ী একটুক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, মলয়কে আমি চিনি। দয়ীর বন্ধু। আজকাল বন্ধুদের মধ্যে ওসব হয় না।

সবই হয়।

চিঠিটা আমাকে দেখাবে?

সরিতের এবার বুঝি একটু লজ্জা করে। বলে, দেখার কিছু নেই। যা বলেছি তা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারো।

মৃন্ময়ী খুব নিবিড় চোখে লক্ষ্য করছে সরিৎকে। বলে, অবিশ্বাস করিনি। শুধু দেখতে চাইছি। একটা কারণ আছে।

কী কারণ?

কদিন আগে বাবুনকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ট্যাকসিতে বাবুন সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল। তখন পকেট থেকে ভাঁজকরা একটা কাগজ বের করে পড়ছিল দেখেছি। আমি কিছু বুঝতে পারিনি তখন। মলয়ের চিঠি কি বাবুনই তোমাকে এনে দিয়েছে?

সরিৎ আর একবার স্ত্রীর দিকে তাকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু এবার তাকাতেই পারল না। তবে গলায় প্রচণ্ড ঝাঁঝ তুলে বলল, দিলে কী করবে? মারবে?

তা কেন ? বাবুনকে মারব সে সাধ্যি কি আমার আছে ?

সাধ্যি না থাকাই মঙ্গল। দয়ীকেও সেটা বুঝিয়ে দিও। ও নাকি আজ বাবুনকে মারার কথা তোমাকে বলছিল। ওকে বলে দিও ওর বাপ যত বড় গুণ্ডাই হোক আমার বাবুনের গায়ে যদি কেউ হাত তোলে তার হাতখানা আমি কেটে দেবো।

মৃন্ময়ী খুবই বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এ কথার কোনো জবাব দিল না। সরিতের হঠাৎ চাগিয়ে-ওঠা রাগটা পড়ে যাওয়ার জন্য সময় দিল। তারপর বলল, বাবুনকে কেউ মারবে না। এখন বলো তো, চিঠিটা কি বাবুন তোমাকে চুরি করে এনে দিয়েছিল ?

চুরি করতে যাবে কেন ? সাম হাউ অর আদার চিঠিটা ওর হাতে এসে গিয়েছিল, ও পকেটে করে নিয়ে এসে আমাকে দেয়।

অন্যের চিঠি জেনেও সেটা আনা কি বাবুনের উচিত হয়েছে ?

সে বিচার আমি করব। বাবুন কিছু অন্যায় করেনি। চিঠিটা সে আমার হাতেই এনে দিয়েছে।

তা হোক, তবু সেটা অন্যায়। তুমিই বা দয়ীর চিঠি পড়তে গেলে কেন ? কেন বাবুনকে শাসন করলে না ?

সরিৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে, দয়ী যা করে বেড়াচ্ছে সেটা বেশি অন্যায়, না চিঠি পড়াটা বেশি অন্যায় ? এই বাজে ক্যারেকটারের মেয়েটাকে আমার ভাইয়ের গলায় ঝোলাতে চাইছো, সেটাও কি অন্যায় নয় ?

সরিতের চিৎকারে মৃন্ময়ী মিইয়ে গেল। সরিৎ লাল হয়ে যাচ্ছে রাগে, ঠোঁটে ফেনা জমছে, কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মৃন্ময়ী। তারপর আস্তে করেই বলল, দয়ীর কথা

নাই বা ভাবলে। ও খারাপ ভাল যাই হোক, তোমার বা বাবুনের দিকটা তো ভাববে! ও কেন চিঠিটা পড়ল? কত বাজে কথা থাকে প্রেম ভালবাসার চিঠিতে। ও সেগুলো পড়েছে ভাবতেই যে গা ঘিনঘিন করে।

সরিতের একটু লজ্জা করছিল। ভিতরে বেলুন চোপসানোর মতো একটা ক্লান্তিকর হতাশা। এদিকটা সে কখনো ভেবে দেখেনি। চিঠিটা পেয়ে একটা মস্ত যুদ্ধাস্ত্র পেয়ে যাওয়ার আনন্দে সরিৎ সেটা নিয়ে সোজা এক ফটোগ্রাফারের দোকানে গিয়ে ছখানা ফটোস্টাট কপি করায়। চিঠিখানা সযত্নে রেখে দেয় স্টিলের আলমারিতে। ইচ্ছে ছিল দয়ী এবং শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে এগুলোকে সে কাজে লাগাবে।

সরিৎ কোনো জবাব দিল না দেখে মৃন্ময়ী বলে, তুমিও কাজটা পুরুষের মতো করোনি।

সরিৎ ধমকে উঠল না বটে কিন্তু বিষ মেশানো শ্লেষের হাসি হেসে বলল, তাই নাকি? তোমাদের রক্তে যে দোষ রয়েছে সেটা বললেই বুঝি পুরুষত্বের অপমান হবে?

মৃন্ময়ী আর কথা বলল না, উঠে চলে গেল।

বাইরে অন্ধকার ঘনাল। ঘরটা হয়ে উঠল আরো উজ্জ্বল। সরিৎ বিনয়ের রেখে-যাওয়া প্যাকেট থেকে অনভ্যাসের হাতে আর একটা সিগারেট বের করে ধরাল। ছাদে ওরা কী করছে—ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে থাকে সরিৎ।

॥ মলয় ॥

যেখানেই কিম্ভূত মোটর-সাইকেলটা দাঁড় করায় মলয় সেইখানেই লোকের ভীড় জমে যায়। এত বিশাল চেহারা আর জটিল যন্ত্রপাতি-ওলা মোটর-সাইকেল কলকাতার লোক খুব বেশি দেখেনি।

হরিয়ানার এক সম্পন্ন চাষী-ঘরের ছেলে এই যন্তরটা কিনে এনেছিল আমেরিকা থেকে। তাদের জমিতে একর প্রতি যে গমের ফলন হয় তা নাকি বিশ্ব-রেকর্ড। সেই সূত্রেই সে সারা পৃথিবী চষে বেড়ায় বছরভোর। অফিসের কাজে দিল্লিতে গিয়ে ছোকরার সঙ্গে এক হোটেলে ভাব জমে গেল মলয়ের। কথায় কথায় ছোকরা জানাল, সে আর কয়েক দিনের মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চাষীদের গমের চাষ শেখাতে যাচ্ছে। অনেকদিনের প্রোগ্রাম। কাজেই মোটর-সাইকেলটা তার কোনো কাজে লাগবে না এখন। তার ইচ্ছে আরো আধুনিক, আরো বেশি শক্তির একটা যন্তর কেনা। শুনে মলয় তক্ষুনি রফা করে ফেলল। ট্র্যাভেলারস চেক ভাঙিয়ে কিনে ফেলল বিকট যানটা। আনকোরা নতুন জিনিস নয়, তা ছাড়া হরিয়ানার চাষী ছোকরা জোরে চালাতে গিয়ে বারকয়েক অ্যাক-সিডেণ্ট করায় মোটর-সাইকেলটা তুবড়ে-তাবড়েও গেছে অনেকটা। তবু এই জাহাজের মতো বিশাল যন্ত্রযানটির এখনো যা আছে তা তাক ধরিয়ে দেওয়ার মতো।

অফিসটা মলয়ের নিজের। তার বাবার মস্ত একটা রং-এর কারবার আছে। অঢেল পয়সা। মলয়দের সাত ভাইয়ের মধ্যে চার

ভাই বাবার ব্যবসায় খাটছে। বাকি তিন ভাইয়ের মধ্যে একজন রেলের ডাক্তার, মলয় হচ্ছে ছ' নম্বর। পরের ভাই সেণ্টজেভিয়ার্সের ছাত্র। বাবার ব্যবসাকে মলয় বরাবর বলে, এ রং বিজনেস। কলেজে পড়ার সময় নকশাল রাজনীতিতে মেতে যাওয়ার ফলে মলয়ের লেখাপড়া খুব বেশি দূর এগোয়নি। বি এস-সির শেষ বছরে সে পড়াশুনো ছেড়ে দেয়। পড়ে পরীক্ষা দিলে একটা দারুণ রেজাল্ট করতে পারত। পড়াশুনোর মতো তাদের আন্দোলনটাও হঠাৎ মাঝপথে থেমে যায়। তখন মলয়ের হাতে অনেক রক্তের দাগ এবং ভিতরে অতৃপ্ত ফোঁসফোঁসানী। পিছনে পুলিশ এবং প্রতিপক্ষের নজর ঘুরে বেড়ায় সব সময়। তাই কিছুদিন একদম একা চুপচাপ নিজেদের খিদিরপুরের বাড়ির চিলেকোঠায় অন্তরীণ হয়ে রইল সে। তারপর বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে সার এবং কীটনাশকের ব্যবসা খুলে বসল।

ব্যবসার যে এ রকম রবরবা হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। প্রথমে দুটো তিনটে অনামী কোম্পানির ডীলারশিপ নিয়ে বসেছিল, পরে নামী দামী বহু কোম্পানি তাকে এজেনসি গছানোর জন্য ঝুলোঝুলি শুরু করে। বড় বড় কোম্পানি এখন এজেণ্ট আর ডীলারদের টি ভি সেট থেকে শুরু করে দামী দামী গিফ্ট আর প্রাইজ দিচ্ছে। প্রচুর কমিশন। টাকায় গড়াগড়ি খাচ্ছে মলয়। আজকাল প্রায়ই তাকে দূর দূরান্তে গ্রামে-গঞ্জে চলে যেতে হয়। কেবল কলকাতায় বসে বসে মাল বেচে যাওয়ার পাত্র সে নয়। মলয় জানে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে চাষীদের সঠিক প্রয়োজনগুলো বোঝা যায়, বোঝা যায় কোন সার বা কোন কীটনাশক কেমন কাজ দিচ্ছে। কোনটার চাহিদা বেশি বা কোনটার চাহিদা বাড়ানো উচিত। এই সব মার্কেট রিসার্চ করা

থাকলে লক্ষপতি থেকে কোটিপতি হওয়া কঠিন নয়। তা ছাড়া ব্যক্তিগত জানাশুনো আর বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে অঢেল সুবিধে। তার ইচ্ছে আছে কয়েকটা কীটনাশক সে নিজেই তৈরি করবে, বানাবে একটা ছোটোখাটো ল্যাবরেটরি। প্রোডাকশন হাতে থাকলে বাজারটা হাতের মুঠোয় চলে আসে। কিন্তু এই প্রোডাকশনে নামার কথাটা সে মনে মনে ভাবতে না ভাবতেই একজন ছোকরা মারোয়াড়ি ঘেরাফেরা শুরু করেছে। সে টাকা খাটাতে চায়। মলয় ল্যাবরেটরি বানালে সে টাকা দেবে। তা ছাড়া, ডিলারশিপেও সে টাকা ঢালতে ইচ্ছুক। চাই কি গোটা ব্যবসাটাই মোটা টাকায় কিনে নিতে পারে। মলয় এই প্রস্তাবগুলো নিয়ে আজকাল খুব চিন্তিত। গোটা কলকাতাটাই এখন মারোয়াড়ি আর বেশ কিছু অবাঙালী ব্যবসাদারের হাতে। বাঙালীর যে ব্যবসাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সেটাই প্রায় অবিশ্বাস্য দাম হেঁকে কিনে নেয় কেউ না কেউ। কিনে যে ব্যবসাটাকে হাতে রাখে সব সময় তাও নয়। অনেক সময়েই বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ তারা অনভিপ্রেত প্রতিযোগিতাকে গলা টিপে নিকেশ করে। মলয় ছেলেটাকে সাফ জবাব দেয়নি বটে, কিন্তু তার মনটা খাট্টা হয়ে আছে। আগে মারোয়াড়িরা মদ-মাংস খেত না, আজকালকার নব্য মারোয়াড়িরা সব খায়। এই ছোকরা একদিন মলয়কে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁয় অনেক টাকা ওড়াল, প্রচণ্ড মাতাল হয়ে গেল এবং তারপর মলয়কে সোজাসুজি বলল, তোমরা তো বুদ্ধুর জাত। বাঙালী বলতেই আমরা বুঝি বোকা লোক। যে টাকা কামাতে পারে না সে আবার চালাক কিসের ?

হক কথা। মলয়ের রক্ত গরম হলেও কথাটা সে মনে রেখেছে। এখন তার ধ্যান জ্ঞান একটাই—টাকা কামাতে হবে। তাদের

পরিবারের প্রায় সকলেরই ব্যবসার ধাত। মলয় ব্যবসাটা ভালই বোঝে। তাই খুব অল্প সময়ে কোনো রকম লোকসান না খেয়ে সে দু হাতে টাকা কামাই করেছে এবং করছে। চমৎকার গুড উইল দাঁড়িয়ে গেছে বাজারে। স্থায়ী ক্রেতার সংখ্যা এখন অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। আগে চাষের মরশুমেই যা কিছু ব্যবসা হত, অন্য সময়টা মন্দা। আজকাল আধুনিক কৃষির কল্যাণে সারা বছরই প্রায় কৃষি কাজ হচ্ছে। মলয়ের তাই মন্দা সময় বলে কিছু নেই।

কিন্তু সব সময়েই এই একঘেয়ে ব্যবসা এবং টাকা রোজগার করে যাওয়া মলয়ের কাছে প্রচণ্ড বিরক্তিকর। তার ভিতরে একটা রোখা চোখা তেজী অবাধ্য মলয় রয়েছে। সেই মলয় সত্তরের দশককে মুক্তির দশক করার কাজে নেমে এক নদী রক্ত ঝরিয়েছিল। এই টাকা আয়কারী মলয়ের সঙ্গে তার আজও খটাখটি। মলয় তাই সব সময়েই কেমন রাগ নিয়ে থাকে, অল্পেই ফুঁসে ওঠে। সে মারকুট্টা, বদমেজাজী এবং অনেকটাই বেপরোয়া। বন্ধুরা তাকে ভয় খায়। খদ্দেররা তাকে সমঝে চলে।

এই খর ধুন্ধুমার গ্রীষ্মকালে বাঁকুড়ার সোনামুখীতে সাত সাতটা দিন কাটিয়ে এল মলয়। গায়ের চামড়া এ ক'দিনেই রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে, কিছু রোগাও হয়ে গেছে সে। বড় চুল রুখু হয়ে কাঁধ ছাড়িয়ে নেমেছে। সকালে স্নানের সময় কলঘরের আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখল সে। কিন্তু চেহারা নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কিছু নেই। বরাবরই টান টান ধারালো ইস্পাতের মতো চেহারা তার। মুখখানা হয়তো নিটোল নয়, কিন্তু হনুর বড় হাড়, ভাঙা গাল এবং একটু বসা চোখ সত্ত্বেও সে অতীব আকর্ষণীয় চেহারার মানুষ। লোকে তাকে দেখলেই বোঝে, এ লোকটা জোর খাটাতে

জানে। খুবই আত্মবিশ্বাসময় তার চলাফেরা, হাবভাব। কথাবার্তায় সে অহঙ্কার প্রকাশ করে না, কিন্তু তার মর্যাদাবোধ যে টনটনে এটা সবাই বুঝে নেয়। কথা খুব কমই বলে, ঠাট্টা বা রসিকতা বেশি পছন্দ নয়।

স্নান করে খেয়ে অফিসে বেরোনোর সময়ে সে আকাশের পশ্চিম ধারে পিঙ্গল ঝোড়ো মেঘ দেখতে পেল। বাতাস কিছু জোরালো, খুব ধুলো উড়ছে। কয়েকদিনই পর পর বৃষ্টি হয়ে গেছে কলকাতায়। যেখানে বৃষ্টির দরকার সেখানে অর্থাৎ গ্রামে-গঞ্জে তেমন হচ্ছে না।

ভ্রূ কুঁচকে কথাটা ভাবতে ভাবতে সে তাদের বড় গ্যারাজে ঢুকে মোটরসাইকেলটা হিঁচড়ে বের করল। প্রচণ্ড ভারী আর বিপুল চেহারার এই জগদ্দলটা যে প্রাণ পেলে কী ভীষণ গতিতে ছুটতে পারে তার ধারণাই অনেকের নেই; মোটরসাইকেলে স্টার্টারে পা রেখেই সে প্রশান্ত আত্মতৃপ্তি বোধ করে।

ঝোড়ো হাওয়া আসছে, বৃষ্টির গন্ধে মাখামাখি বাতাস। পারবে কি সে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টেরিটিবাজারের অফিসঘরে পৌঁছোতে?

ক্র্যাশ হেলমেটটা মাথায় এঁটে নিয়ে স্টার্টারে লাথি মারে মলয়। খিদিরপুরের ঘিঞ্জি পেরিয়ে রেসকোর্সের গা ঘেঁষে অর্ধবৃত্তাকার চওড়া ফাঁকা রাস্তার ওপর হোণ্ডা পৃথিবীর সব গতিকে যেন ছাড়িয়ে গেল। আইনস্টাইন বলেছেন, আলোর গতি প্রাপ্ত হলে যে কোনো বস্তুই আলোয় পর্যবসিত হয়। মলয় তেমনি এই বিদ্যুতের গতিতে যেতে যেতে তড়িতায়ত হয়ে গেল। সে আর তার মোটরসাইকেল দুয়ে মিলে যেন একটিই প্রাণ, এক সত্তা। অবশ্য কলকাতার রাস্তায় গতির

সুখ বড়ই ক্ষণিক। ডালহৌসি ঘুরে লালবাজার স্ট্রিট দিয়ে এসে সে ধরল বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট। নাজ সিনেমার কাছাকাছি বাঁ হাতের গলিতে খানিক গিয়ে এক মস্ত পুরোনো বাড়ি। ভিতরে এক বাঁধানো চত্বর ঘিরে বড় বড় টিনের গুদামঘর। সামনের দিকে পাঁচতলা বাড়ির তেতলায় তার অফিসঘর। চত্বরে মোটরসাইকেল রেখে ওপরে ওঠে মলয়।

সে না থাকলে অফিস সামলাবার দায়িত্ব পুণ্যর।

তাকে দেখে পুণ্যর সদাবিষণ্ণ মুখের ভাব একটুও বদলাল না। রোগা কালো ছোটোখাটো নিরীহ চেহারার পুণ্য লোহার চেয়ারে পা তুলে বসেছিল। মলয়কে দেখে শুধু পা দুটো নামিয়ে বসল।

মলয় জিজ্ঞেস করে, সব খবর ভাল তো ?

হুঁ।

কে কে এসেছিল লিস্ট করে রেখেছো ?

হুঁ।

দেখি।

পুণ্য একটা বাঁধানো একসারসাইজ বুক এগিয়ে দেয়। মলয় দেখতে থাকে। শেষ পৃষ্ঠায় নামের বদলে ছোট একটু লেখা : তোর সঙ্গে দরকার ছিল। আজ বিকেলে অফিসে থাকিস। রুকু।

মলয় তার হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে সস্তায় কেনা রিভলভিং চেয়ারে বসল। বলল, জল

বশংবদ পুণ্য নিঃশব্দে উঠে গিয়ে বারান্দায় রাখা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনে কাচের গ্লাসে। জল খেয়ে মলয় বারোয়ারি বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বসে এবং পুণ্যর দিকে কয়েকপলক তাকায়। কী করে পুণ্য এক হাতে গ্লাস ধরে সেই হাতেই জল গড়িয়ে আনে তা

কখনো দেখেনি মলয়। তবে দরকার হলে মানুষ সবই পারে। কিছুকাল আগেও সে দেখেছিল কনুই থেকে দু হাত কাটা একটা লোক দূবপাল্লার ট্রেনে সোডা লেমনেড ফেরি করছে। মস্ত ভারী লেমনেড বোঝাই ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সে চলন্ত গাড়ির এ কামরা থেকে ও কামরায় অনায়াসে যাতায়াত করত, ঐ দুটো ঠুঁটো হাতেই বোতলের ঢাকনা খুলে স্ট্র ভরে লেমনেডের বোতল ধরত খদ্দেরের মুখের সামনে, পয়সা গুণে নিয়ে গেঁজেতে ভরে রাখত। পুণ্যর তো তবু একটামাত্র হাত নেই।

যে সব গাঁয়ের ছেলে ভাল করে না বুঝেই পলিটিকসে নেমেছিল পুণ্য তাদের একজন। খড়্গপুর-কাঁথি রাস্তায় নারায়ণগড়ে তার বাড়ি। বেশ ভাল ছবি আঁকত, তবলা বাজানোর হাত ছিল, কমার্স স্ট্রিমে সেকেণ্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে কাঁথি কলেজে ভর্তিও হয়েছিল সে। একদিন ভাবের বশে দশক মুক্তির আন্দোলনে নেমে পড়ল। প্রতিপক্ষের বোমায় ডান হাতটা উড়ে যাওয়ার পর থামল এবং টের পেল, ডান হাতের সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে গেছে তার ছবি আঁকা, তবলা বাজানো, লেখাপড়া এবং রাজনীতি। ক্ষত শুকিয়ে ওঠার পরও বেশ কয়েক মাস পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল পুণ্য। বেশ কয়েক বছর আগে আহত পুণ্যকে কাঁথি হাসপাতালে দেখে এসেছিল মলয়। পরে যখন সার আর কীটনাশকের ব্যবসাদার হয়ে সে আবার নারায়ণগড়ে যায় তখন দেখে, আধপাগলা পুণ্য বসে থাকে সারাদিন রাস্তার ধারের এক চায়ের দোকানের বেনচে। কথা বলে না, বিড়বিড় করে আর লোক দেখলেই মাথা নীচু করে মুখ লুকোয়।

মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখলেই মলয় গলে পড়ে না বা বিমর্ষ হয়

না। তার মন অত নরম তো নয়ই বরং সে পৃথিবীর লোক-সংখ্যা বোমা মেরে কমিয়ে ফেলারই পক্ষপাতী। পুণ্যর অবস্থা দেখে তার মোটেই দুঃখটুঃখ হয়নি। তবে তার কেমন মনে হয়েছিল আধ-পাগলা লোকেরা বড় একটা অসৎ হয় না। তাই পুণ্যকে তুলে আনল মলয়। একশ' টাকা মাইনে দিত। এমনিতে পুণ্য তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। হিসেবে ভুল করে, অনেক কথা ভুলে যায়, অন্যমনস্ক থাকে। তবে পুণ্যর ধ্যানজ্ঞান এই অফিসটাই। একদিন সে মলয়কে বলল, আপনাদের বেয়ারাটাকে ছাড়িয়ে দিন না, জল চা আমিই দিতে পারব। মাইনে কিছু বেশি দিতে হবে। মলয়ের তাতে আপত্তি হয়নি। আগে বাইরে থেকে চা আসত। পুণ্য এখন সে পাট তুলে দিয়ে একটা জনতা স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম কিনে নিয়েছে। বাইরের দিককার বারান্দার কোণে একটু টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গা করে এক হাতে দিব্যি চা বানায়। তার জন্য আলাদা পয়সা নেয়। মলয়ের কোনো আপত্তি নেই। এই অফিসেই চব্বিশ ঘণ্টা থাকে পুণ্য। লোহার আলমারির পিছনে চটে জড়ানো তার একটা বিছানা আছে। রাতে হাফ সেক্রেটারিয়েটের ওপর বিছানাটা পেতে কুঁকড়ে শুয়ে থাকে। দুশো টাকার মতো আয় করে। তা থেকে অর্ধেক বাড়িতে পাঠায়। অপদার্থ পুণ্যর এটাই ঢের সাফল্য।

নামের লিস্ট ধরে ধরে মলয় কয়েকটা টেলিফোন করে। বেশির ভাগই কাজ কারবারের কথা। সবশেষে ফোনটা করল রুকুকে। বার চারেক ডায়াল করার পর পেল।

রুকু, তুই এসেছিলি ?

হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল।

কী দরকার ?

গিয়ে বলব।

বিকেলে আমি হয়তো অফিসে থাকব না। দিন সাতেক ছিলাম না, অনেকগুলো অর্ডার পিছিয়ে আছে।

কিন্তু টেলিফোনে তো বলা যাবে না।

কথাটা কী নিয়ে তা তো বলবি ?

দয়ী।

দৈ ? কিসের দৈ ?

দয়ী দয়ী। দয়াময়ী।

ওঃ। দয়ীর আবার কী হল ?

সেটাই তো বলতে আসব।

ধ্যাৎ। সিরিয়াস কিছু থাকলে বল। মেয়েছেলে নিয়ে কথা বলার কী আছে! ইজ এনিথিং রং ?

একটু দ্বিধা করে রুকু বলে, তেমন কিছু নয়। আমি আসছি আজ। তুই থাকিস।

বলছি তো, থাকার অসুবিধে আছে।

রুকু একটু হাসল। বলল, অসুবিধে হলেও বোধ হয় তোকে থাকতেই হবে। বাইরের দিকে চেয়ে ছাখ কী ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে।

বাস্তবিকই মলয় চোখ তুলে দেখল বাইরে পাঁশুটে আলো। ধুলোর ঝড়ের সঙ্গে এইমাত্র বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি এল। মলয় বলল, ইডিয়েট। বৃষ্টি হলে আমি না হয় বেরোতে পারব না, কিন্তু তুই-ই বা বেরোবি কি করে ? আমার অফিসে তোকে তো আসতে হবে।

রুকু একটু চুপ করে থেকে বলে, সেটাও কথা। তবু তুই থাকিস। দয়ী আমাকে ওর পক্ষের উকিল হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে। মক্কেলকে ফেরাতে পারিনি।

কিন্তু মামলাটা কিসের ?

গিয়ে বলব। জানিস তো অফিসের টেলিফোন খুব সেফ নয়।

জ্বালালি। আচ্ছা আয়।

বলে ফোন রাখল মলয়। বস্তুত বন্ধুদের মধ্যে রুকু তার সবচেয়ে প্রিয়। তার প্রিয় হওয়ার মতো কোনো কারণ রুকুর নেই। কোনো বিষয়েই তাদের মেলে না। রুকু শান্ত, চিন্তাশীল, রাজনীতি থেকে শত হাত দূরের লোক, হীনমন্যতায় ভোগে। তবু প্রিয়। বোধ হয় অসহায় বলেই প্রিয়।

ঝড়বৃষ্টির দামাল ঝাপটা থেকে ঘর বাঁচাতে পুণ্য গিয়ে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করল। ঘরের পাখাটা মলয় না বলতেই চালিয়ে দিল। কিন্তু পাখা ঘুরল না। কারেন্ট নেই। কিন্তু সেটা লক্ষ্য করল না মলয়।

মলয় ভ্রূ কুঁচকে নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থাকে। আজ আর কাজ কিছু হবে না। বৃষ্টিতে কোনো পার্টিই আসবে না। একঘেয়ে অফিসঘরে বন্দী থাকার মতো শাস্তি তার কাছে আর কিছু নেই।

না বলতেই খুব বিনীত ভঙ্গিতে চা করে নিয়ে এল পুণ্য। মলয় ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকায়। পুণ্যর সঙ্গে আড্ডা মারার চেষ্টা বৃথা। কথা বললে অর্ধেকের জবাব দেয় না, বাকি অর্ধেকের জবাব দেয় হুঁ হ্যাঁ না করে। বেশ বোকাও আছে পুণ্য, তার ওপর পাগল। মলয় কথা বলার চেষ্টা করে না ওর সঙ্গে, শুধু কী করতে হবে তা বলে দেয়। পুণ্য সব সময়েই আদেশটা পালন করে। ও শুধু হুকুম তামিল করতে জানে।

মলয় চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, আলোটা জ্বালিয়ে দাও।

জ্বালানোই আছে। কারেন্ট নেই। পুণ্য মাথা নীচু করে বলে।

এই ঝড়বৃষ্টির দুপুরে আর কেউ না আসুক, যে মারোয়াড়ি ছোকরা তার ব্যবসায় টাকা খাটাতে চাইছে সেই সইকুমার এসে হাজির। বর্ষাতিটা দরজার কোণায় টাঙিয়ে ঘরে এল। 'হাই' বলে মারকিন কায়দায় উইশ করে চেয়ার টেনে বসল। খুবই দামী ঝকঝকে হাওয়াই শার্ট আর ট্রাউজারস পরনে। বৃষ্টিতে একটু ভিজেছে। সইকুমার বাংলা হিন্দী দুটো ভাষাই জানে, কিন্তু কথা বলে রিজিতে। কলকাতার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলেমেয়েরা যেমন বদহজমের মতো গোল্লা গোল্লা ইংরিজিতে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে কথা বলে তেমনি তার ইংরিজি। বলা বাহুল্য, সইকুমারও মধ্য কলকাতার এক নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছিল। তবে পরবর্তীকালে সে কয়েকবার বিদেশেও ঘুরে এসেছে। সে প্যারিস আর টোকিওর মেয়েমানুষদের কথা বলতে ভালবাসে।

সইকুমার বসেই বলল, আই ওয়েন্ট টু ব্যাণ্ডেল লাস্ট উইক। গট এ গুড সাইট ফর ইওর ল্যাবরেটরি। এ লিটল ওভার ফিফটিন থাউস্যাণ্ড অ্যাণ্ড একসপেনসেস।

মলয় কথা বলল না। তাকিয়ে রইল।

সইকুমার টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে বসে মলয়ের দিকে খুব বন্ধুর মতো তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। তারপর বলে, ইউ আর গেটিং কোয়াইট বিগ অর্ডার্স। হোয়াই ডোনচ ইউ টেক সাম এফিসিয়েন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টস? দ্যাট হাফ উইট অব ইয়োরস, দ্যাট ব্যাস্টার্ড পুণ্য ইজ গুড ফর নাথিং। আই কেম লাস্ট ইভনিং টু আসক অ্যাবাউট ইউ অ্যাণ্ড দ্যাট ইডিয়ট অফ এ ম্যান জাস্ট কেপট মাম।

ইংলিশ মিডিয়ামের কৃপায় গোল্লা ইংরিজিতে মলয়ও একসময়ে

কথা বলতে ভালবাসত। তারপর গাঁ-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে চাষীবাসীর সঙ্গে কথা বলে বলে সে রোগটা গেছে। সে পরিষ্কার বাংলায় বলল, দেখ সইকুমার, পুণ্য কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ, ইংরিজি বোঝে একদিন তোমার নাক থেঁতো করে দেবে।

সরি সরি। নো হার্ড ফিলিং! বলে সইকুমার সোজা হয়ে বসে ফর্সা টকটকে তার রঙ, ছিপছিপে চেহারার সুদর্শন তরুণ। খুবই স্মার্ট। হেসে বলল, নাউ টু বিজনেস। ব্যাণ্ডেলের সাইটটা কবে দেখতে যাবেন?

মলয় উদাস হয়ে বলে, তাড়া কী?

তাড়া আছে। ব্যাণ্ডেল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেলটের মধ্যে। ওখানে জমি বেশি দিন পড়ে থাকবে না। ইন ফ্যাকট জায়গাটা আমার এত পছন্দ হয়েছে যে, আমি ফাইভ থাউস্যাণ্ড অ্যাডভানসও করে এসেছি।

এই সব বদান্যতার পিছনে কী কূটকৌশল আছে তা নিজে ব্যবসাদারের ছেলে হয়েও ঠিক বুঝতে পারছে না মলয়। দিনকাল যত এগোচ্ছে ততই মানুষ নানারকম নতুন প্যাঁচ বের করছে মাথা থেকে সইকুমার নিজে টাকা ঢেলে তাকে প্রোডাকশনে নামাতে চায়, সেট নিশ্চয়ই তাকে শিল্পপতি বানানোর জন্য নয়। পুরো ফিনানসট থাকবে ওর হাতে, মলয় হবে শিখণ্ডী—এরকমটাই ভেবেছে কি সইকুমার! নাকি মলয় নিজে থেকে প্রোডাকশনে নেমে একটা কিছু করে বসে সেই ভয়ে সইকুমার সেফটি ভালভ হিসেবে নিজে ওর ভিতরে ঢুকে বসতে চাইছে?

ভাবতে ভাবতে মলয় বলল, জায়গাটা তো আমার পছন্দ নাও হতে পারে।

কোনো ডিফিকালটি নেই। পছন্দ না হলে ছেড়ে দেবো। ফাইভ থাউস্যাণ্ড ইজ নাথিং। না হয় তো জায়গাটা কিনে ফের বেচে দেওয়া যাবে। কাস্টমারের কমতি নেই। আজকাল লোক সব কিছু কেনে। জমি, বাড়ি, এনি সর্টস অব গুডস। বিজনেসম্যানরা বেচতে বেচতে হয়রান হয়ে যাচ্ছে।

মলয় হাসল না, কিন্তু মজা পেল। চারদিকে উদ্‌ভ্রান্ত ক্রেতাদের ভিড় দিনরাত সেও তো দেখছে। বাজার গরম। সে বলল, এখনো আমি কিছু ঠিক করিনি সইকুমার। এজেনসির জন্যই মেলা খাটতে হচ্ছে। প্রোডাকশনে গেলে আরো খাটুনি।

পয়সার জন্য খাটতে তো হবেই। কিন্তু প্রোডাকশনে আমি আছি, আপনার চিন্তা কি? একসপেরিয়েনসড লোক রেখে দেব। এ লিমিটেড কোমপানি ওয়ানস এসটাব্লিশড গোজ অন ইটসেলফ।

তারপর কি হবে সইকুমার? লিমিটেড কোমপানি হবে, নিজে থেকে চলবে, প্রোডাকশন হবে, মাল বিক্রি হবে, কিন্তু তারপর কি হবে?

সইকুমার হাসল। ঝকঝকে দাঁত। বলল, ইট গোজ বিগার অ্যাণ্ড বিগার।

তারপর?

মার্কেট পেয়ে যাবেন, প্রোডাকশন বাড়তে থাকবে, এর মধ্যে কোনো তারপর নেই। এজেনসির চেয়ে প্রোডাকশনের ইজ্জত বেশী।

মলয় তা জানে। তবু মনশ্চক্ষে সে একটা দাবার ছক দেখতে পায়। প্রতিপক্ষ খুব ভাল মানুষের মতো আপাততুচ্ছ চাল দিচ্ছে। সেই চাল কতটা বিপজ্জনক তা তাকে ভেবে দেখতে হবে। সইকুমারকে সোজাসুজি না বলতেও সে পারছে না। কারণ, ইচ্ছে

করলে ও নিজের টাকাতেই প্রোডাকশনে নামতে পারে। কিন্তু যেহেতু মলয়কে টানতে চাইছে সেই জন্যই মলয়ের লোভ এবং সন্দেহ।

নিঃশব্দে পুণ্য এসে সইকুমারকে চা দিয়ে গেল। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

সইকুমার তার ডান হাতের ঢিলা ব্যাণ্ডে বাঁধা মস্ত ঘড়িটার দিকে চাইল। বিদঘুটে ঘড়ি। ডায়ালের মধ্যে ছোটো ছোটো আরো গোটা কয়েক ডায়াল। একগুচ্ছের টাকা গেছে। সইকুমার বলল, দি ওয়েদার ইজ হেল। আজ গাড়ি নিয়ে ফেঁসে যাবো।

চা খেয়ে সইকুমার উঠল। বলল, তা হলে ব্যাণ্ডেল কবে যাবেন? গাড়িতে ম্যাকসিমাম ওয়ান আওয়ারস জার্নি। একটু আউটিং হবে। হাউ অ্যাবাউট নেকসট সানডে?

দেখছি। আমি তোমাকে ফোনে জানাবো।

সইকুমার চলে গেলে মলয় ধৈর্যভরে টেলিফোন করে করে বিভিন্ন কোমপানিতে নতুন মালের অর্ডার দিল। বাঁকুড়ার বহু এজেণ্ট তার হাতে এসে গেছে। সঙ্গে করে সে প্রায় দু লাখ টাকার অর্ডার এনেছে, অনেক কাজ। আবহাওয়া এরকম না হলে সে নিজে গিয়ে কয়েকটা সাপ্লায়ারের সঙ্গে দেখা করত। বাইরে ঝড় কমেছে বটে, কিন্তু চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে তুলে বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। দরজার কাচে জল জমে আছে। অন্ধকার এবং বদ্ধ বাতাসের ভ্যাপসা গরম আটকে আছে ঘরের মধ্যে। আগে বৃষ্টিকে সে বৃষ্টি হিসেবেই দেখত। আকাশ থেকে জল পড়ছে। আজকাল রোদ বা বৃষ্টির সঙ্গে চাষবাস এবং তার নিজের ব্যবসাকে জড়িয়ে সে হিসেব করে।

চিঠিপত্রের একটা ছোটো-খাটো ডাঁই জমেছে। মলয় আবছা

আলোয় কয়েকটা খুলে দেখল। ভাল পড়া যায় না। তাই আর চেষ্টা করল না। বসে বসে রুকুর কথা ভাবতে লাগল। রুকুর এমন কী জরুরী দরকার ?

ভাবতে ভাবতে পাঁচ মিনিটও যায়নি, রুকু এসে হাজির। ছাতাটা মুড়ে দরজায় ঠেসান দিয়ে রাখতেই সেটা থেকে অঝোর জল ঝরে পড়তে থাকে। রুকুর জামা কাপড়ও সপসপে ভেজা। ছাতায় বৃষ্টি তেমন আটকায়নি বোঝা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকেই বলল, আজ আর বাড়ি ফেরা যাবে না দেখছি। রাস্তায় গোড়ালি সমান জল জমে গেছে। ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাম বন্ধ।

মলয় স্থির চোখে চেয়ে দেখছিল রুক্‌কে। কোনো কথা বলল না। বৃষ্টিতে কলকাতার কী দুর্দশা হতে পারে তা তার চেয়ে বেশী আর কে জানে।

রুকু এক গাল হেসে বলল, সারা পথ ভিজতে ভিজতে এলাম আর যেই তোর অফিসের দোরগোড়ায় এসেছি অমনি বৃষ্টি থামল।

থেমেছে! বলে লাফিয়ে ওঠে মলয়। গিয়ে এক ঝটকায় বারান্দার দরজা খুলে ফেলে। হা-হা করে ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে ঘরে ঢোকে। দু-একটা জলকণাও সঙ্গে আসে বটে, তবে বৃষ্টি বাস্তবিকই থেমেছে।

মলয় ঘড়ি দেখে বলল, এখনো সময় আছে। দু-একটা অফিসে ঢুঁ মারতে পারা যায়। তোর কথাটা চটপট সেরে ফেল।

রুকু দুঃখিত মুখ করে বলে, পুরোনো বন্ধুকে এভাবে ঘাড়ধাক্কা দিতে হয়! দয়ী ঠিকই বলে, তুই আর আগের মতো নেই।

আগের মতোই চিরকাল যারা থেকে যায় তারা ইম্ম্যাচুয়োরড। আমার কাজ কারবার সবার আগে, তারপর সময় থাকলে ফ্রেণ্ডশীপ।

এখন গা তোল তো বাপ।

কোথায় যাবি ?

চল তো।

রুকু ওঠে। অফিস থেকে বেরিয়ে বাঁ হাতে কিছু দূর হেঁটে মলয় তাকে একটা দেড় তলার রেস্তরাঁয় নিয়ে আসে। টেরিটিবাজারে এমন চমৎকার ছিমছাম রেস্তরাঁ আছে তা যারা না জানে তারা ভাবতেও পারবে না।

মলয় টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে বসে বলল, বল এবার।

রুকু কোনো ভণিতা করার সময় পেল না। চিরকালই মলয় কাঠখোট্টা গোছের। সোজা কথা বলতে এবং শুনতে পছন্দ করে। রুকু তাই চোখ বুজে বলে ফেলল, তুই দয়ীর পিছনে লেগেছিস কেন ?

তোকে কি দয়ী একথা বলেছে ?

বলেছে এবং বলছে। প্রায় রোজই টেলিফোন করে।

কী বলছে ?

বলছে তুই ওকে বিয়ে করতে চাস। ও রাজী নয়।

তুই কি ওর সেভিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছিস ? আমি ওকে বিয়ে করতে চাইলে তুই ঠেকাতে পারবি ?

রুকু সামান্য অবাক হয়ে বলে, এটা গুহামানবদের যুগ নয় মলয়। নেগোশিয়েসনের যুগ। গা-জোয়ারি করছিস কেন ? চাইলে বিয়ে করবি। তাতে কি ? কিন্তু দয়ীরও তো মতামত আছে !

এবার মলয় সামান্য হাসল। টেবিলের কাছে একটা বেয়ারা এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আলুর চপ, ঘুঘনি আর চায়ের কথা বলে মলয় কিছুক্ষণ পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল। তার পর হঠাৎ

চোখ খুলে সোজা হয়ে রুকুর দিকে চেয়ে বলল, সারাদিন দয়ীর কথা আমি পাঁচ মিনিটও ভাবি না। আমি কস্মিনকালেও দয়ীর প্রেমে পড়িনি। তবু আমি মনে করি দয়ীর আমাকেই বিয়ে করা উচিত।

কেন ?

কারণ দয়ী আমার সঙ্গে একাধিকবার শুয়েছে।

শুনে রুকু কিছুক্ষণ কথাটার নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর বলল, সেটাই কি যথেষ্ট কারণ ?

সেটাই একমাত্র কারণ রুকু।

দয়ী তো এই কারণকে আমল দিচ্ছে না।

দেওয়া উচিত। শরীরটা তো ফ্যালনা নয় যে শরীরের সম্পর্কটা উড়িয়ে দিতে হবে।

রুকু করুণ একটু হেসে বলল, দয়ী তোকে শরীর হয়তো দিয়েছে, কিন্তু মন বলেও তো একটা কথা আছে !

মলয় মাথা নেড়ে বলে, মন বলে দয়ীর কিছু নেই। দয়ী কেন, দয়ীর জেনারেশনের কারো নেই। ওসব বস্তা-পচা শব্দ। ইউজলেস। আমি যদি দয়ীকে বিয়ে করি তবে সেটা ওরই সৌভাগ্য।

রুকু মোলায়েম স্বরে বলে, তুই হঠাৎ দয়ীর জন্য ক্ষেপে গেলি কেন বল তো !

ক্ষেপেছি কে বলল ?

তুই নাকি ওকে প্রেমপত্র লিখিস ? আর তাতে নাকি সব ভাবের কথা থাকে !

মলয় মৃদু হাসল। মাথা নেড়ে বলল, প্রেমপত্র লিখি বটে তবে কথাগুলো আমার নয়। চৌরঙ্গীর এক বুকস্টল থেকে "ফেমাস লাভ লেটার্স" নামে একটা বই কিনেছিলাম। সেটা থেকে অনুবাদ করে

দিই। প্রেমপত্র লেখার এলেম আমার কই? সময়ও পাই না।

রুকুর হাসি পেল না। গম্ভীর মুখে বলল, দয়ীকে ছেড়ে দে না মলয়। বেচারা এ বিয়ে চাইছে না। রিসেন্টলি ও নাকি একজন স্ট্যাটেবল লোককে পেয়ে গেছে। সে বিয়ে করে দয়ীকে অ্যামেরিকা নিয়ে যাবে। কিন্তু দয়ীর ভয়, তুই নাকি ঠিক সেই সময়ে বাগড়া দিবি। আফটার অল তুই যে ঘ্যাম নকশাল ছিলি সেটা ও ভুলতে পারছে না।

নকশাল ইজ এ ডেড পাস্ট। ওসব কথা ওঠে না। নকশাল ছাড়া কি ভয়ংকর লোক নেই? আমি নকশাল না হলেও ওর সুবিধে হত না।

তুই কী করতে চাস?

কিছু করব তো বটেই। তবে সেটা যে কী তা এখনো ঠিক করিনি। দয়ীকে কিডন্যাপ করলে কেমন হয়?

ইয়াকি মারিস না। কিডন্যাপ করলে পুলিশ-কেস।

বেয়ারা চপ আর ঘুঘনি রেখে গেল। দারুণ ভাল গন্ধ ছাড়ছে রুকু আর মলয় খেতে লাগল। খেতে খেতেই মলয় মুখ তুলে বলল আমার চেহারাটা কেমন রে?

রুকু এক ঝলক চেয়ে দেখে গম্ভীর মুখেই বলে, চোঁয়াড়ের মতো ইয়েট খানিকটা অ্যাপীল আছে।

অ্যাপীলটা কিসের? সেকস?

ন্‌না!

তবে?

খুব শক্ত পোক্ত চেহারা। বোধ হয় তোর মতো মানুষের ওপ মেয়েরা নির্ভর করতে পারে।

তবে দয়ী নির্ভর করতে চাইছে না কেন ?

দয়ীও যে খুব শক্ত মেয়ে। ও চায় এমন পুরুষ যে ওর ওপরই নির্ভর করবে।

ভ্রূ কুঁচকে মলয় বলে, তা হলে আমাদের ম্যাচ করে না বলছিস ?

বোধ হয় না।

তা হলে অ্যামেরিকা থেকে দয়ীর ভাল পাত্তর এসেছে !

তাই তো বলছে।

খামোখা একটা গা-জ্বালানো হাসি হাসছিল মলয়। বলল, দয়ী আমাকে চায় না কেন জানিস ?

আমাকে খুব একটা ভেঙে কিছু বলেনি। তবে বলছিল বন্ধুকে কি বিয়ে করা যায় !

সেটা কোনো কথা নয়। আমি একটা জিনিস মানি। ও যখন আমাকে শরীরটা দিয়েছে তখন বাকিটাও দেওয়া উচিত।

রুকু সহজে বিরক্ত হয় না। এবার হল। বলল, শরীরের কথা বার বার তুলছিস কেন ? দয়ী হয়তো তোকে ছাড়াও আর কাউকে শরীর দিয়েছে। তা বলে সবাইকে বিয়ে করতে হবে নাকি ?

খুব চোখা নজরে রুকুকে দেখল মলয়। তার পর বলল, তোর ধৈর্য কমে যাচ্ছে রুকু। আগের মতো তোর সহনশীলতা নেই।

রুকু লজ্জা পেল। তবে স্বীকার করল না। বলল, তুই অত শরীর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন ?

মলয় স্থির চোখে চেয়ে বলে, তোর একটা সুবিধে আছে রুকু ! তোর শরীর লাগে না। তুই বোধ হয় এখনো সেই কবেকার গুলি খেয়ে মরা তাপসীকে ভেবে মাসটারবেট করে যাচ্ছিস।

এই অপমানে রুকুর মুখের সুস্বাদু ঘুঘনি ছাইয়ের মতো বিস্বাদ

হয়ে গেল। চামচটা নামিয়ে রেখে কিছু সময় মাথা নীচু করে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর প্রবল মানসিক চেষ্টায় মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

মলয় সামান্য তেরছা হাসি হেসে বলল, কথাটা উড়িয়ে দিস না। মাসটারবেট যারা করে তাদের চেহারায় লাবণ্য থাকে না, চোখ গর্তে ঢুকে যায়, এবং ক্রমে ক্রমে তাদের চিন্তাশক্তি, নার্ভের জোর আর মানসিক ভারসাম্য কমে আসে। তোর মধ্যে সব ক'টা লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি।

রুকু সাদা মুখে মড়ার মতো হাসে একটু। কথাটা অপমানকরই শুধু নয়, সত্যও। তাই তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায় উপর্যুপরি গুলি খেয়ে। কোনো কথাই আসে না মুখে।

মলয় তেমনি শান্ত, নিরুদ্বেগ, নিষ্ঠুর ভঙ্গীতে বলে, আমি তোকে থরোলি জানি রুকু। তোর বোর্ডিংয়ে এক বিছানায় আমি অনেক রাত কাটিয়েছি। তোকে খামোখা অপমান করার জন্য তাপসীর কথা তুলিনি। আমি জানি তুই এখনো সেই মরা মেয়েটাকে নিয়ে ঘুমোতে যাস। আমি ষোলো বছর বয়স থেকে রক্তমাংসের তরতাজা মেয়েমানুষ ঘাঁটছি। আমার কোনো সেন্টিমেণ্ট নেই। তবু আমি দয়ীকে বিয়ে করার কথা কেন ভাবছি জানিস?

রুকু নিজের ভিতরের শূন্যতায় ডুবে বসেছিল। একটা কথাও তার কানে ঢুকছিল না। তবু মলয় কিছু জিজ্ঞেস করছে বুঝতে পেরে মুখ তুলল।

মলয় বলে, বেশ কয়েক বছর আগে দয়ী আমার দারুণ অ্যাডমায়ারার ছিল। তখন আমি বিপ্লবী ছাত্রনেতা। দয়ী প্রায়ই বলত, তোমার মতো ভয়ংকর পুরুষকেই আমি সবচেয়ে ভালবাসি। কিছু

মনে করিস না, দয়ীর হয়তো খানিকটা ফাদার অবসেশনও ছিল। ওর বাবা ছিল ফোর্থ গ্রেড গুণ্ডা। যাই হোক, সে সময়ে একদিন দয়ী খুব সাহস করে আমাকে বলল, চলো বাইরে কোথাও ক'দিন বেরিয়ে আসি। আমি ইংগিতটা বুঝলাম। দয়ী শরীরের সম্পর্ক চাইছে। আনইউজুয়াল কিছু নয়। ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে গিধনী নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে আমার এক বন্ধু রেলে চাকরি করে। প্রায়ই যেতাম। রেল কোয়ার্টারের দু-একটা সব সময়েই খালি পড়ে থাকে। কোনো অসুবিধে ছিল না, একদিন দয়ীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে উঠলাম। কিন্তু প্রথম দিনই শালবনে বেড়াতে গিয়ে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেল। কয়েকটা ছেলে ছোকরা আমাদের পিছনে লেগেছিল একটু। সেটাও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কলকাতায় এরকম তো কত হচ্ছে। আমি মাইণ্ড করিনি। ওরা তেমন খারাপ কিছু বলেওনি। একজন বলে উঠেছিল, ছাখ ছাখ, কলকাতার মাল ছাখ। শালা গিধনীতে মজা লুটতে এসেছে। কিন্তু দয়ী ব্যাপারটা উড়িয়ে না দিয়ে ভীষণ ফুঁসে উঠল। ফিরে দাঁড়িয়ে ইডিয়েট, গ্রাম্য, কোনো দিন মহিলা দেখেনি, ব্লাণ্ট হেডেড ইত্যাদি বলে গালাগাল দিতে লাগল। ছেলেগুলোও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ওটা ওদেরই তো জায়গা। তারাও রুখে উঠে বলতে লাগল, কেরদানী বের করে দেবো, গিধনীতে মজা করতে আর আসতে হবে না। কলকাতার ফুটানী কলকাতায় গিয়ে দেখাবেন। আমি মাঝখানে পড়ে থামানোর চেষ্টা করি, কিন্তু দয়ী ছাড়বার পাত্রী নয়। যে ছোকরাটা দু কদম এগিয়ে এসে বেশী তেজ দেখাচ্ছিল, দয়ী ছুটে গিয়ে পায়ের স্লিপার খুলে তার গালে ঠাস করে বসিয়ে দিল। তারপর যা হয়। ছোকরারা আমাদের ঘিরে ফেলল চোখের পলকে। কিল ঘুঁষি লাথি চলতে

লাগল সমানে। আমি এসব ছোটোখাটো ঝুট ঝামেলা পছন্দ করি না। তবু দয়ীর সম্মান রাখতে অনিচ্ছের সঙ্গেও লড়তে হল। ছেলেগুলো কিছুক্ষণ খামচাখামচি করে হাঁফাতে থাকে। তারপর শাসায়। আমি তখন তাদের গায়ে-টায়ে হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করি। ব্যাপারটা মিটেও যায়। কিন্তু সেই থেকে দয়ী বেঁকে বসল। সেই রাত্রেই আমাদের প্রথম একসঙ্গে শোওয়ার কথা। কিন্তু দয়ী কিছুতেই রাজী নয়। কেবল কাঁদে আর বলে, ওই বদমাশরা আমার শরীরের লজ্জার জায়গায় হাত দিয়েছে, মেরেছে, আর তুমি ওদের তোয়াজ করলে! তুমি কি পুরুষ মানুষ? আমি এতদিন তোমাকে নিয়ে অন্য স্বপ্ন দেখতুম। সারা রাত চোখের জল আর খোঁচানো কথা দিয়ে দয়ী আমাকে যথেষ্ট তাতিয়ে তুলল। এ কথা সত্যি যে, আমি পলিটিকসের জন্য কয়েকটা খুন করেছি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে মানুষকে মেরে ফেলার কথা আমি ভাবতেও পারি না। কিন্তু সেই রাতে দয়ী শরীর দেয়নি বলে কামে ব্যর্থ হয়ে আমি ক্ষেপে উঠেছিলাম। দয়ী আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, ছোকরাদের পালের গোদাকে ফিনিশ করব। পরদিন একটু খোঁজ নিতেই ছোকরার পাত্তা মিলল। পশ্চিমধারে মস্ত একটা মাঠের গায়ে নির্জন জায়গায় তার বাড়ি। সন্ধ্যের মুখে একটু গা ঢাকা দিয়ে দয়ী আর আমি গিয়ে বাড়ির কাছাকাছি ঝোপ জঙ্গলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর দয়ীর তখন কী উত্তেজনা! বার বার আমার হাত চেপে ধরছে, এমন কি চুমুও খাচ্ছে। কখনো পাগলের মতো হাসছে, কখনো কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটু পরেই একটা খুন করতে হবে ভেবে আমি দয়ীর দিকে মনোযোগ দিতে পারছি না। তবু আমার একটা চোখ সারাক্ষণ দয়ীকে লক্ষ্য করছিল। আমার মন বলছিল,

এ খুনটা কেবলমাত্র দয়ীর শরীরের জন্যই আমাকে করতে হচ্ছে না তো! যদি তাই হয় তবে দয়ীর শরীরের জন্য আমাকে অনেকটাই মূল্য দিতে হল। ভাববার বেশী সময় ছিল না। আচমকা দেখলাম, নির্জন মাঠের পথ ধরে একা হেঁটে আসছে একটা ছেলে। খুবই আবছা দেখাচ্ছিল তাকে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়ালাম। এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে টর্চ। একেবারে কাছাকাছি এসে ছোকরা আমাকে দেখে হয়তো থমকে গিয়েছিল। দপ করে টর্চের আলো মুখে ফেলে মুখটা চিনে নিয়েই একদম পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করলাম। ফাঁকা মাঠে গুলির শব্দটা প্রায় শোনাই গেল না। ছোকরা কোঁস করে একটা শব্দ করে কুঁকড়ে পড়ে গেল। আর দেখার কিছু ছিল না। মুখ ফেরাতেই দেখি আমার পিঠ ঘেঁষে দয়ী দাঁড়িয়ে আছে। স্থির চোখে কিছুক্ষণ ছোকরার মৃত্যুযন্ত্রণার ছটফটানী দেখল, তারপর আমার দিকে মুখ ফেরাল। শান্ত মুখ, চোখে সম্মোহিত মুগ্ধ দৃষ্টি। আমার ভয় ছিল, দয়ী হয়তো চেঁচামেচি করবে, অজ্ঞানটজ্ঞান হয়ে যাবে। আশ্চর্য, তার কিছুই হল না। আমি স্পট থেকে কখনো দৌড়ে পালাই না। তাতে বেশী বিপদ ঘটে। খুব স্বাভাবিক চালে একটু ঘুরপথ হয়ে আমরা বড় রাস্তায় উঠলাম এবং যেন বেড়িয়ে ফিরছি ঠিক এমনভাবে বাজারের ভিতর দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। পথে একটা চায়ের দোকানে বসে চাও খেলাম। কপাল ভাল বলতে হবে। খুনটা নিয়ে হৈ-চৈ হলেও আমাকে কেউ সন্দেহ করেনি। করার কারণও ছিল না। গিধনীতেও তখন দু দঙ্গলে ঝগড়াঝাঁটি মারপিট চলছিল কী নিয়ে। সন্দেহ গিয়ে পড়ল বোধ হয় সেই ছোকরার উল্টো দলের ওপর। সে যাকগে। সেই রাতে দয়ী আমাকে

শরীর দিয়েছিল। কিন্তু আমার সেদিন একরত্তি ইচ্ছেও ছিল না। মনটা ভার ছিল। এই প্রথম আমি নন-পলিটিক্যাল কারণে, কেবলমাত্র একটা মেয়েকে খুশি করতে একজনকে মারলাম। কিন্তু দয়ীর হল উল্টোরকম। সেই রাতের মতো খুশি, আনন্দিত এবং উত্তেজিত দয়ীকে আমি আর কখনো দেখিনি। মনে মনে সেইদিনই ঠিক করি, দয়ীর পুরো সাইকোলজিটা আমাকে জানতে হবে। সারাজীবন ধরে বিশ্লেষণ করে, গবেষণা করে আমি দেখব দয়ীর জেনারেশনের মেয়েরা কতখানি নষ্ট হয়ে গেছে। রুকু, দয়ীকে আমার ছাড়া চলে না। আমার কাছে ওর অনেক ঋণ। আমি ওকে ভালবাসি বা না বাসি দয়ীকে আমি অনেক দাম দিয়ে কিনে নিয়েছি। ব্যাপারটা হয়তো তুই ঠিক বুঝতে পারবি না। ইউ আর এ ব্র্যাণ্ডেড রোমান্টিক মাস্টারবেটার।

এবার রুকু আর ততটা অপমান বোধ করল না। কানটা লাল হল, মাথা নুয়ে এল ঠিকই, তবু মনে হল. মলয় তাকে এরকম অপমান করার অধিকার রাখে।

॥ রুকু ॥

রাতে রুকুর ভাল ঘুম হল না। শেষ রাতে সে একেবারেই জেগে গেল। এই এজমালি বাড়িতে ছাদে ওঠা বারণ, বারান্দা নেই। ফলে বাইরেটা দেখতে হলে সদর খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়।

ঘামে ভেজা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রুকু। মাথাটা বড্ড গরম। পাগলের মাথায় যেমন হাজারো ছেঁড়া টুকরো স্মৃতি ও কথা ঘূর্ণী ঝড়ে

উড়ে বেড়ায় তার মাথাটাও আজ অমনি। আধো-ঘুমে বারবার একটা সুরে বাঁধা গানের লাইন ঘুরে বেড়াচ্ছিল মাথায়—ধূলায় হয়েছে ধূলি। ধূলায় হয়েছে ধূলি। কোন গানের লাইন তাও ঠিক মনে নেই। এখন জেগেও সে টের পাচ্ছে, প্রচণ্ড একটা বিষণ্নতায় ভারাক্রান্ত তার মাথা ভাঙা রেকর্ডে পিন আটকে যাওয়ার মতো গানের সেই কলিটা জপ করছে, ধূলায় হয়েছে ধূলি।

মলয়ের মতো রুকুর কোনো যৌন-জীবন নেই। সে কখনো মেয়েমানুষের স্বাদ পায়নি। বরাবরই সে ভীতু, লাজুক। কলকাতায় এসে তার মেয়ে বন্ধু জুটেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কারোই খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। কিন্তু কী এক আশ্চর্যজনক কারণে তার ব্যক্তিগত যৌনক্ষুধাকে আজও অধিকার করে আছে সেই কবেকার সামান্য একটি মৃত মেয়ে তাপসী। এই অস্বাভাবিকতার কোনো ব্যাখ্যাও সে খুঁজে পায় না। কিন্তু বুঝতে পারে, এটা এক ঘোর বিকৃতি। বুদ্ধিমান মলয় সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল।

নিজেকে নিয়ে আজ ভারী মুশকিল হল রুকুর। এই ভোরের পরিষ্কার সুন্দর পবিবেশে সদর খুলে সে রাস্তায় পায়চারী করতে করতে কেবলই চাইছে রুকুর সঙ্গে সহাবস্থান ছিন্ন করতে। নিজেকে সে সহ্য করতে পারছে না মোটেই। বড্ড ছোটো লাগছে, তুচ্ছ লাগছে, হাস্যকর মনে হচ্ছে।

সকাল হলে রুকু যখন দাড়ি কামাতে বসল তখন ছোটো আয়নায় আজ বড় শীর্ণ ও লাবণ্যহীন দেখল নিজেকে। চোখ কোটরগত, গাল বসা, দৃষ্টিতে দীপ্তি নেই।

কিছুই ভাল লাগল না আজ।

অফিসে এসে সে ফোন করল দয়ীকে।

দয়ী, আমি রুকু।

বলো।

মলয়ের সঙ্গে দেখা করেছি।

দয়ী খুব সিরিয়াস গলায় বলল, মলয় কিছু বলল ?

সে অনেক কথা। এ কাজটার ভার আমাকে দিয়ে তুমি ভাল করোনি। মলয় কাল আমাকে খুব অপমান করেছে।

তোমাকে ? তোমাকে অপমান করবে কেন ? তুমি তো কিছু করোনি !

রুকু আচমকা জিজ্ঞেস করে, তুমি কোনোদিন মলয়ের সঙ্গে গিধনী গিয়েছিলে দয়ী ?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় দয়ী বোধহয় একটু থতমত খায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, শুধু গিধনী কেন, আরো অনেক জায়গায় গেছি।

রুকু সামান্য ধৈর্য হারায়। বিরক্তির স্বরে বলে, কথাটা এড়িয়ে যেও না দয়ী। তুমি যে মলয়ের সঙ্গে অনেক জায়গায় গেছ সে আমি জানি, তুমিও বহুবার বলেছো। তবু আমি পার্টিকুলারলি গিধনীর কথাটা জানতে চাই।

দয়ী সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কোনো কারণে রেগে আছো রুকু ? তোমাকে আমি কখনো রাগতে দেখিনি, মাইরি বলছি।

রুকু একটু লজ্জা পায়। গলা নামিয়ে বলে, রেগেছি কে বলল ?

গলা শুনে মনে হচ্ছিল। মলয় কি তোমাকে খুব অপমান করেছে ? দেখা হলে ওকে বলব তো।

কিছু বোলো না দয়ী, প্লীজ। কাতর স্বরে বলে রুকু।

দয়ী একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি গিধনীর কথা কী জানতে চাইছিলে ?

রুকু সতর্কভাবে তার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। ফোনের কাছাকাছি কেউ নেই। কেউ শুনছে না। একটু চাপা গলায় সে বলে, গিধনীতে তোমাকে খুশি করার জন্য মলয় একটা মার্ডার করেছিল দয়ী, মনে পড়ে ?

মার্ডার! দয়ী আকাশ থেকে পড়া গলায় বলে ওঠে, মার্ডার ? কী বলছ তুমি ?

রুকু একটু ঘাবড়ে যায়। তারপর মিনমিন করে বলে, সেখানে শালবনে নাকি তোমাদের সঙ্গে এক দল ছেলের গণ্ডগোল হয়েছিল ?

দয়ী অবাক গলায় বলে, তা তো হয়েছিলই। ছেলেগুলো আমাকে আওয়াজ দেওয়ায় ঝগড়া লাগে। আমি একটা ছেলেকে চটিপেটা করেছিলাম। ওরা আমাদের ঘিরে ধরেছিল।

তারপর কী হয়েছিল দয়ী ?

কী আবার হবে ! সেই রাত্রে অপমানে আমি খুব কেঁদেছিলাম।

মলয়কে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলোনি ?

বলেছি। তাতে কি ?

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় মলয় কি সেই ছেলেদের সর্দারকে গুলি করে মারেনি ?

দয়ী হঠাৎ হাসতে থাকে। বলে, তোমাকে বোকা পেয়ে গুল ঝেড়েছে মলয়। গুলি করবে কি ? ওর কাছে তো আর্মস ছিল না। তাছাড়া আমরা সেখানে নতুন জায়গায় গেছি, কিছুই তেমন জানি না। মার্ডার কি অত সোজা রুকু ? পুরো গুল।

সত্যি বলছ ?

তুমি কী করে ভাবলে আমাকে খুশি করতে মলয় খুন করতে যাবে ? মলয় কি অত বোকা ? আমি ছাড়াও ওর তখন ডজনখানেক

বান্ধবী ছিল। কাউকেই কোনোদিন খুশি করার দায়িত্ব নেয়নি মলয়। বরং আমরাই ওকে খুশি করতে চাইতাম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, গিধনীতে মলয় কাউকে খুন করেনি।

রুকু লক্ষ্য করে, যার টেবিলে ফোন সেই পালবাবু বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। মস্ত হলঘরটা পার হতে যেটুকু দেরী। সে তড়িঘড়ি চাপা-স্বরে বলে, ফোনে আর বেশীক্ষণ কথা বলা যাবে না দয়ী, অসুবিধে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল।

পরে হবে দয়ী।

রুকু ফোন রেখে নিজের টেবিলে ফিরে আসে এবং চুপ করে বসে থাকে। সে কতদূর নির্বোধ তা ভেবে থৈ পাচ্ছিল না। মলয় যে তাকে মাসটারবেশনের কথা তুলে লজ্জা দিয়েছিল তা আসলে একটা অতিশয় কূটবুদ্ধির চালাকি। কথাটা তুললে রুকু যে সংকুচিত হয়ে নিজের ভিতরে লজ্জায় গুটিয়ে যাবে তা খুব ভালভাবে জেনেই মলয় চালটা দিয়েছে। আর তারপরই এমনভাবে গিধনীর খুনের বানানো গল্পটা ঝেড়েছে যা রুকু সেই মানসিক অবস্থায় বিশ্লেষণ করে দেখেনি। ইংরিজিতে যাকে বলে কট ইন দি রং ফুট। কিন্তু খুনের ঘটনাটা বলার পিছনে মলয়ের আর কোন কূটবুদ্ধি কাজ করছে তা ভেবে পায় না রুকু। তাই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে। মলয় কাল বলেছিল দয়ীদের জেনারেশন কতদূর নষ্ট হয়ে গেছে তা সে জানতে চায়। কথাটা ভেবে আজ হাসি পাচ্ছে রুকুর। মলয় কোনোদিনই মেয়েদের নষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায়নি। বরং একসময়ে এ নিয়ে রুকুই লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিত। তার ছিল মফঃস্বলের গেঁয়ো মানসিকতা। মেয়েদের শরীরের পবিত্রতা ছিল তার অতিশয় শ্রদ্ধার জিনিস।

মলয় কি সেটারই পাল্‌টি দিল কাল? ওটা কি নিছক রুকুকে ঠাট্টা করার জন্যই বলা?

বেলা পাঁচটা পর্যন্ত রহস্যটা রহস্যই থেকে গেল।

অফিস থেকে বেরোবার মুখে জানলা দিয়ে আজও বাইরে বর্ষার মেঘ দেখতে পায় রুকু। আজও বৃষ্টি হবে। বড় বেশী দেরীও নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, তাতে বৃষ্টির গন্ধ মাখা। অফিসের পর আজকাল রুকুর কোথাও যাওয়ার নেই। তার বন্ধুরা বেশীরভাগই বড় সড় চাকরি করে। কারোই হাতে ফালতু সময় নেই। রুকু নিজেও আড্ডা দেওয়ার সময় পায় না। চাকরি ছাড়াও টিউশানি আছে। তবু আজ তার একটু হালকা সময় কাটানোর বড় ইচ্ছে হচ্ছিল। দীর্ঘদিন বিরামহীন কাজ ও একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি মাথাটাকে ভার করে রেখেছে। আর সে কিছুতেই মলয়ের অপমানটাকে ভুলতে পারছে না। বারবার একটা আয়না কে যেন তার মুখের সামনে তুলে ধরছে, আর সে নিজের কোটরগত চোখ, ভাঙা চোয়াল, লাবণ্যহীন শুষ্ক মুখশ্রী দেখছে। তার বোধহয় কিছু ভিটামিন-টিন খাওয়ার দরকার। আর দরকার বিশ্রী আত্মমৈথুনের পুরোনো অভ্যাস থেকে মুক্তি। সংসারের দায়িত্বের কথা ভেবে এতকাল সে বিয়ের কথায় কান পাতেনি। আজ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে ভাবছিল, বিয়ে করলে কেমন হবে? ভাবছিল, মা সন্তোষপুরে যে উকিলের মেয়েটির কথা প্রায়ই বলে তাকে একবার গিয়ে দেখে আসবে। পছন্দ হলে এবার বিয়ের সম্মতি দিয়ে দেবে। ভাল হোক, মন্দ হোক জীবনের একটা খাত বদল এবার দরকার।

অফিসের বড় দরজার মুখেই সে থমকে গিয়ে এক গাল হাসল। বলল, তুমি?

মাস দুই দয়ীর সঙ্গে দেখা হয়নি। ফোনে কথা হয়েছে মাত্র দয়ী এই দু মাসে কিছু রোগা হয়েছে। নাকি এই রুগ্নতাকেই স্লিমনেস বলে আজকাল? খুবই সাধারণ ম্যাটম্যাটে রঙের একটা বাদামী তাঁতের শাড়ি পরনে, সাদা ব্লাউজ। মুখে কোনোদিনই তেমন প্রসাধন মাখে না দয়ী। আজ প্রসাধনহীন মুখখানা বেশ ঘামতেলে মাখা। একটু হেসে বলল, কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তোমাকে চমকে দেবো বলে।

চমকে একটু দিয়েছো ঠিকই। জানিয়ে রাখলে অফিস থেকে কিছু আগে বেরিয়ে আসতাম।

দয়ী মুখ টিপে একটু হেসে বলল, কিংবা জানালে হয়তো আমাকে এড়ানোর জন্য অফিস থেকে আগে ভাগেই কেটে পড়তে তুমি যা ভীতু!

না, না। লজ্জা!—বলে একটু হাসে রুকু।

ফুটপাথ ঘেঁষে দয়ীর ফিয়াট দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে দয়ী বলল, ওঠো।

চুপি চুপি একটু আরামের শ্বাস ছাড়ে রুকু। আজকের দিনটা অন্তত বাসের ভীড়ে চিংড়ি লাদাই হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না। দয়ী লিফট দেবে।

পাশে ড্রাইভিং সিটে বসে দয়ী গাড়ি চালু করে বলে, তোমাকে আমার পার্সোনাল প্রবলেমের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে ভাল কাজ করিনি রুকু। কাল মলয় তোমাকে কেন অপমান করল খুব জানতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য খুব সেনসিটিভ ব্যাপার হলে বোলো না।

রুকুর মুখ চোখ লজ্জায় নরম হয়ে যায়। সে চোখ নীচু করে কোলের ওপর নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থাকে।

দয়ী ময়দানের দিকে গাড়ি চালায়। আড়চোখে একবার রুকুর মুখের ভাব লক্ষ্য করে বলে, তোমাকে মলয় কতটুকু অপমান করেছে জানি না। কিন্তু আমাকে ওর কাছে বহুবার হাজারো অপমান সইতে হয়েছে। আমার বাবার পাস্ট হিস্টিরি খুব ভাল নয়, জানো তো! কথায় কথায় ও আমার বাবা তুলে যাচ্ছেতাই সব কথা বলে। তোমাকে তো আমার লুকোনোর কিছু নেই রুকু। আমি সতীত্ব-টতীত্ব মানি না। স্কুল লাইফ থেকেই ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে ফ্রীলি মিশি। সেই জন্যও মলয়ের রাগ। ও যখন নিজে আমার সঙ্গে লাইফ এনজয় করেছে তখনো আমাকে প্রস ট্রস বলে গালাগাল করেছে। মাইথনে গিয়ে একবার আমাকে মলয় মেরেছিল। তখন ওকে ভাল-বাসতাম বলে সব সহ্য করেছি। ইন ফ্যাকট তখন ও আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া মাত্রই আমি রাজী হয়ে যেতাম। কিন্তু আফটার অল দিজ ইয়ারস আমি এখন অনেক ম্যাচিওরড। আমি জানি মলয় কেমন লোক। বলে চুপ করে থাকে দয়ী।

মলয় কেমন লোক দয়ী? রুকু জিজ্ঞেস করে।

রেস্টলেস, ক্রুয়েল অ্যাণ্ড রেকলেস। খুব শীগগীরই একদিন ওর পাগলামি দেখা দেবে। পলিটিকস ছেড়ে দিয়েছে বটে কিন্তু সেই সব আক্রোশ আর রাগ এখনো জমে আছে ওর ভিতর। ও আমাকে বিয়ে করতে চায় কেন জানো?

বোধহয় তোমাকে নিয়ে ওর কিছু একসপেরিমেণ্ট এখনো বাকি।

ঠিক তাই। অর্থাৎ প্রত্যেক দিন ওর বিষের থলিতে যত বিষ জমা হয়ে টনটন করে তা উজাড় করার জন্য ঠিক আমার মতো একজনকে ওর দরকার। ও আমার বাবার ইতিহাস জানে, আমার

সমস্ত দুর্বলতাকে জানে। ও জানে কতভাবে আমাকে নির্যাতন আর অপমান করা যায়।

রুকু একটু হাসল। বলল, কত করুণ ছবি আঁকছো দয়ী! কিন্তু আমি জানি মেয়েরা মোটেই অত অসহায় নয়। খুব সাদামাটা নিরীহ মেয়েও কিন্তু আর কিছু না পারুক স্বামীকে শাসনে রাখতে জানে। সে তুলনায় তুমি তো অনেক বেশী অ্যাডভানসড মেয়ে।

দয়ী রঞ্জী স্টেডিয়াম পেরিয়ে গঙ্গার ধারে চলে এল। গাড়িটা ফুরফুরে হাওয়ায় দাঁড় করিয়ে বলল, মিথ্যে বলোনি। কিন্তু মলয় অ্যাভারেজ পুরুষদের মতো তো নয়। ও অনেক বেশী হিংস্র, অনেক বেশী ঠাণ্ডা রক্তের মানুষ। ও কত অপকটে হাসিমুখে আমাকে বেশ্যা বলে গাল দেয় তা তুমি জানো না। মাইথনে সেবার আমাদের প্রচণ্ড ঝগড়া হলে আমি রেগে গিয়ে ওকে বলেছিলাম, তুমি আসলে হোমোসেকস্যুয়াল, তাই মেয়েদের নিয়ে তোমার সুখ হয় না। তাইতে ভীষণ রেগে গিয়ে ও আমাকে প্রচণ্ড মেরেছিল। পরে ভেবে দেখেছি, কথাটা আমি রাগের মাথায় হয়তো খুব মিথ্যে বলিনি। মে বি হি ইজ হোমোসেকস্যুয়াল। নইলে অত ক্ষেপে উঠবে কেন কথাটা শুনে?

রুকুর ভিতরে টিকটিক করে কিছু নড়ে উঠল। কাল মলয় তাকে খুব লজ্জা দিয়েছিল, আজ মলয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মতো একটা অস্ত্র সে পেয়ে গেছে; কিন্তু অস্ত্রটা কোনোদিনই ব্যবহার করতে পারবে না রুকু। সে কাউকে সামনা সামনি অপমান করতে পেরে ওঠে না। শুধু চিন্তিতভাবে বসে রইল সে। দয়ী আর মলয়ের অপবিত্র কাম ও ঘৃণার সম্পর্কের কথা ভাবতে লাগল!

দয়ী তাকে কনুইয়ের একটা ছোট্ট ঠেলা দিয়ে বলল, কোনো কথা বলছো না কেন রুকু।

রুকু ম্লান হেসে বলে, কী বলব বলো তো! আমি অনেকটাই গেঁয়ো মানুষ। তোমাদের এই আধুনিক মানসিকতা কিছু বুঝতে পারি না। কেনই বা তুমি মলয়কে শরীর দিতে যাও আর কেনই বা মলয় তোমাকে ঘেন্না করে, এসব খুব রহস্যময় আমার কাছে।

দয়ী একটু ধৈর্য হারিয়ে বলে, অত বোকা সেজো না রুকু। শরীরের ব্যাপারে কোনো রহস্য নেই। শরীর তো কোনো দর্শন নয়, কোনো ধর্ম টর্মও নয়, তার কোনো গভীরতাও নেই। নিতান্তই পেটের খিদের মতো একটা মোটা দাগের ব্যাপার। তার আবার রহস্যই কি, শুচিবাইয়েরই বা কি?

রুকু মাথা নেড়ে বলে, তুমি হয়তো জানো না দয়ী, তোমার প্রবলেমটাও শরীর নিয়েই। শরীরের গভীরতা না থাক হ্যাজার্ডস আছে। মলয় আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল, শরীরের জন্যই ও তোমাকে ছাড়তে নারাজ।

মিথ্যে কথা রুকু। যে ডজন ডজন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে তার কখনো একটা বিশেষ মেয়ের জন্য পাগল হওয়ার কারণ নেই। ও যেমন তোমাকে গিধনীর খুনের গল্প বানিয়ে বলেছে এটাও তেমনি আর একটা বানানো কথা।

রুকু বিষণ্ণভাবে বলে, কিন্তু আমার তো আর কিছু করার নেই দয়ী। তোমার জন্য মলয়কে খুন করতে তো আমি পেরে উঠব না।

দয়ী গম্ভীর মুখ করে বলল, খুনের প্রশ্ন ওঠে না।

তবে তুমি ওকে নিয়ে অত ভাবছো কেন দয়ী? ও ভাঙচি দেবে ভয়ে?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, ভাঙচি টাঙচি সেকেলে ব্যাপার। যে লোকটির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে সে অনেক বেশী মডার্ন।

আমার জামাইবাবুর সম্পর্কে ভাই। তার সঙ্গে যাতে আমার বিয়েটা না হয় সে জন্য জামাইবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কোনো কাজ হয়নি। আমাকে লেখা মলয়ের একটা চিঠি পর্যন্ত জামাইবাবু তাকে দেখিয়েছেন। লোকটা তাতেও দমেনি। বিয়ে সে আমাকে করবেই

তবে আটকাচ্ছে কোথায় দয়ী?

দয়ী অবাক হয়ে বলে, কোথাও আটকাচ্ছে না তো! বিয়েটাও খুব নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে। কিন্তু পুরুষদের আমি খুব চিনি রুকু লোকটা বিয়ে করবে বটে কিন্তু তার কমপ্লেকস শুরু হবে বিয়ের পর থেকে। মলয়ের ব্যাপারটা সে খুব ভালভাবে জানে না। একটা প্রেমপত্র থেকে খুব বেশী কিছু আন্দাজ করাও সম্ভব নয়। স্পোর্টস ম্যানের মতো সে তাই এখন ব্যাপারটা গায়ে মাখছে না। কিন্তু বিয়ের পর সামান্য খটাখটি লাগলেই তার মনে নানারকম কমপ্লেকস দেখা দেবে। জানতে চাইবে মলয়ের সঙ্গে আমার কতদূর কী হয়েছিল। লোকটা এমনিতে ভাল, কিন্তু ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল। কোনো কিছুকেই সাবলিমেট করতে জানে না।

রুকু নিজের কপাল টিপে ধরে বলে, ওঃ দয়ী, আমার বোকা মাথায় এই সব শক্ত কথা একদম ঢুকছে না। সরল করে বল।

দয়ী হাসল। বলল, সোজা কথায় লোকটাকে বিয়ে করতে আমার ভয় হচ্ছে। অ্যামেরিকা তো এখানে নয়। সেই দূর দেশে যদি কখনো আমার কান্না পায় তবে সম্পূর্ণ একা একা কাঁদতে হবে। কাউকে কিছু বলার থাকবে না। আমার বড় ভয় করছে রুকু।

রুকু মহান গলায় বলে, তার জন্য তুমিই দায়ী দয়ী। এখন কী করতে চাও?

সেইজন্যই তোমার কাছে আসা। বলো তো কী করব? আজও

বিনয়ের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ক্যালকাটা ক্লাবে ওর এক বন্ধু পার্টি দিচ্ছে। রোজই আমরা একটু একটু করে আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং-এ আসছি। এই সময়টাই সবচেয়ে বিপজ্জনক।

রুকু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবে। তারপর বলে, ভবিষ্যতে কী হবে তা কেই বা জানে। আমি বলি তুমি বরং লোকটাকে বিয়ে করে অ্যামেরিকাতেই চলে যাও। হয়তো লোকটা সবই ক্ষমা করে নেবে।

দয়ী মাথা নেড়ে ঝুঁকে স্টিয়ারিং হুইলে মাথাটা নামিয়ে রাখে। মৃদুস্বরে বলে, জামাইবাবুও ওর কানে অনেক বিষ ঢেলেছে তো। যতদূর খবর পেয়েছি জামাইবাবু মলয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বিনয়ের মুখোমুখী ওকে দাঁড় করাবে। অবশ্য তাতেও বিয়ে আটকাবে না আমি জানি। বিনয় অসম্ভব গোঁয়ার। কিন্তু বিষটা থেকে যাবে যে রুকু।

॥ দয়ী ॥

বিনয় খুব সামান্যই মদ খায়। সিগারেটেও তার তেমন নেশা নেই। তার আসল নেশা হল কাজ। পার্টি শেষ হল রাত দশটা নাগাদ। পার্টিতে আজ তেমন হুল্লোড় ছিল না, লোকজনও ছিল কম। মদের ঢল নামেনি, মাতলামির বাড়াবাড়ি হয়নি। যে আজ পার্টি দিয়েছিল বিনয়ের সেই বন্ধু অজিত ঘোষ দয়ীর হাতে এক গ্লাস শেরী ধরিয়ে দিয়েছিল। সেটাতে একটা বা দুটো চুমুক হয়তো দিয়েছিল দয়ী, এমন সময় বিনয় খুব নিরীহভাবে কাছে এসে তার

কানে অস্ফুট কী একটু বলে হাত থেকে সুকৌশলে গ্লাসটা নিয়ে এক গ্লাস সফট ড্রিংক ধরিয়ে দিয়ে গেল। অবাক হলেও দয়ী প্রতিবাদও করেনি। সামান্য একটু অপমান অবশ্য বোধ করেছিল সে। কচি খুকি তো সে নয় যে, অন্য কেউ তাকে ইচ্ছেমতো চালাবে। মনটা বিরূপ ছিল বলেই বাদবাকী সময়টা সে পার্টির আনন্দটুকু মোটেই উপভোগ করেনি। দায়সারা কথাবার্তা বলল, একটা মাত্র মুর্গীর ঠ্যাং নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে রেখে দিল।

পার্টি শেষ হলে দয়ীর গাড়িতেই এসে উঠল বিনয়। ওঠার কথা নয়। কারণ বিনয় দয়ীর উল্টোদিকে থাকে। নর্থে। বিনয় খুব নরম গলায় বলল, অনেকটা রাত হয়েছে। এত রাত্রে তোমাকে একা যেতে দেওয়া ঠিক নয়। আমি তোমার বাড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়ে ট্যাকসি নিয়ে ফিরব।

দয়ী ভ্রূ কুঁচকে বলল, আমার বেশী রাতে ফেরা অভ্যাস আছে।

কথাটা বলে দয়ী অপেক্ষা করল। কিন্তু বিনয় গাড়ি থেকে নামার লক্ষণ দেখালো না। দয়ী তাই গাড়ি চালু করে বলে, কলকাতা শহরে কিন্তু ইচ্ছেমতো ট্যাকসি পাওয়া যায় না।

বাস আছে। বিনয় শান্ত স্বরে বলে, না হয় কিছু একটা ঠিকই জুটে যাবে।

আমার কোনো পাহারাদারের দরকার নেই। একা আমি বেশ চলতে পারি।

বিনয়ের মুখে হাসি নেই, গাম্ভীর্যও নেই। কথা একটু কম বলে। চুপচাপ নির্লজ্জের মতো বসে রয়েছে। দয়ী ভবানীপুর পর্যন্ত চলে এল বিনা সংলাপে। তারপর বিনয় হঠাৎ বলল, আমি পিউরিটান নই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কেউ মদ খেলে আমার ভাল লাগে না। তুমি

কিছু মাইণ্ড করলে নাকি ?

দয়ী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, ভাল মন্দ বুঝবার বয়স আমার হয়েছে।

বিনয় মৃদুস্বরে বলে, আই অ্যাম সরি। আমি ভাবলাম, অতটা শেরী খেয়ে গাড়ি চালাতে তোমার কষ্ট হবে। তাছাড়া এই গরমে কোনোরকম অ্যালকোহলই শরীরের পক্ষে স্বস্তিকর নয়।

আমি মোটেই অতটা খেতাম না। গাড়ি চালাতে হবে সেটা কি আমার খেয়াল ছিল না ? ভদ্রলোক দিলেন, ভদ্রতা করে নিতে হয় বলে নিলাম। খেতাম না।

ব্যাপারটা ভুলে যাও দয়ী। আমার ভুল হয়েছিল।

দয়ী কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। লোকটাকে তার কখনো খারাপ লাগেনি। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। সে বলল, সারা জীবন এক সঙ্গে থাকতে গেলে আগে থেকেই একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া থাকা ভাল বিনয়।

বিনয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, আগে থেকে কখনো কোনো বোঝাপড়া হয় না। বোঝাপড়ার জন্যই তো একসঙ্গে থাকা।

দয়ী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমি ডোমিনেটিং হাজব্যাণ্ড পছন্দ করি না।

বিনয় সামান্য হাসল। বলল, আমাকে গত দশ দিনে কি তোমার তাই মনে হল ?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, তা নয়। আমি আমার কথা বলছি।

বলার মতো কিছু তো ঘটেনি। শেরীর গ্লাসটাকে তুমি এখনো ভোলোনি দেখছি।

দয়ী থমথমে গলায় বলল, পার্টিতে কেউ কেউ হয়তো ব্যাপারটা

লক্ষ্য করেছে। তারা ধরে নিয়েছে, তুমি আমাকে নভিস হিসেবে গাইডেন্স দিচ্ছো।

ওরকম আর হবে না, কথা দিচ্ছি।

দয়ী হঠাৎ কালীঘাট পার্কের কাছে গাড়ি পার্ক করল। মুখ ফিরিয়ে বিনয়ের দিকে চেয়ে বলল, তুমি আমার সবকিছুই মেনে নিচ্ছো কেন বলো তো ?

বিনয় একটু থতমত খেয়ে বলে, সেটা কি দোষের ?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, দোষের নয়। বরং খুবই উদারতার পরিচয়। কিন্তু আমার কিছু প্রশ্ন আছে বিনয়। আমার জামাইবাবু কি তোমাকে আমার সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথা বলেনি ?

বিনয় ভ্রূ কুঁচকে চিন্তান্বিত মুখে খুব ধীর হাতে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, ওটা নিয়ে তুমি অনর্থক চিন্তা কোরো না। বুধোদা আগে যেমন ছিল এখন আর তেমন নেই। টোটাল ফ্রাস্ট্রেশন থেকে মানুষ কতটা অন্যরকম হয়ে যায় তা আমি জীবনে কম দেখিনি। তাই বুধোদার কথার আমি মূল্য দিই না।

কথাটা বলে বিনয় অকপটে দয়ীর দিকে তাকায় এবং অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে বলে, বয়সে তুমি আমার চেয়ে অনেকটাই ছোটো। তোমার বয়সকে তো কিছুটা কনসেশন দিতেই হবে। বুধোদা সেটা না মানলেও আমি মানি।

দয়ী বিরক্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, ওটা মারকিন মানসিকতার কথা।

বিনয় ধীর স্বরে বলে, ধরতে গেলে আমি তো একজন মারকিনই। বলে সে খুব সুন্দর হাসি হাসে। বিশুদ্ধ আনন্দের হাসি।

দয়ী চোখ নামায় না। স্থির দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে চেয়ে বলে,

দিদির কাছে শুনলাম জামাইবাবু নাকি মলয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তার সঙ্গে তোমার একটা ইনটারভিউয়েরও ব্যবস্থা হচ্ছে। তুমি কি মলয়ের সঙ্গে দেখা করবে?

বিনয়ও চোখ সরাল না। বলল, দেখা করা বা না করায় কোনো অর্থ নেই। তুমি না চাইলে দেখা করব না। চাইলে করব। কিন্তু দেখা করলেও আমার সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না।

সে আমি জানি। কিন্তু তুমি একথা মনে কোরো না যে, আমি বিয়ের জন্য বা অ্যামেরিকায় যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছি। আমার কাছে ওগুলো কোনো ফ্যাকটর নয়।

আমি তা মনে করি না।

দয়ী কী যে বলতে চাইছে তা সে নিজেই ভাল বুঝতে পারছিল না। মাথাটায় কেমন ওলট পালট, বুকে কেমন রাগ আর অভিমানের ঝড়। সামনের রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে সে চুপ করে বসে রইল। সহজে কখনো তার কান্না আসে না। আজ আসছিল। প্রাণপণে সে কান্নাটাকে চাপবার চেষ্টা করছিল।

বাঁ দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে নিবিষ্টমনে প্রায় অন্ধকার পার্কটার দিকে চেয়ে ছিল বিনয়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, পার্কে ওরা কারা বসে আছে বলো তো? অনেকগুলো কাপল্ দেখছি। প্রেমিকপ্রেমিকা নাকি?

দয়ী মৃত্ত একটু হুঁ দিল।

বিনয় বলল, এত রাত পর্যন্ত কী অত কথা ওদের?

দয়ী হেসে বলে, তুমি তো প্রেমে পড়োনি। পড়লে বুঝতে।

বিনয় একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, সে কথা ঠিক। তবে কিনা অ্যামেরিকায় এত ফালতু সময় কারো হাতেই থাকে না। কলকাতায়

তোমরা বড় বেশী সময় নষ্ট করো দেখেছি। পাঁচটা মিনিট সময়ও যে কত মূল্যবান তা কলকাতার লোক বুঝবেই না।

গত দশ দিনে বিনয় এই প্রথম অ্যামেরিকার কথা তুলল। অন্য সব বাঙালি ছেলে বিদেশ ঘুরে এসে যে বিদেশী গল্পের ঝুড়ি খুলে বসে বিনয় সেরকম নয় মোটেই। অ্যামেরিকা নিয়ে দয়ীকে সে কোনোদিনই জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করেনি।

বিনয় হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলে, সময়ের মূল্য তুমিও খুব একটা বোঝো না দয়ী। গাড়ি দাঁড় করিয়ে খামোখা রাত বাড়াচ্ছো।

দয়ী গাড়ি চালু করল। বলল, তুমি সত্যিই আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাবে ?

আর একটু যাই। ফাঁড়িতে নামিয়ে দিও।

মলয়ের সঙ্গে তোমার কবে দেখা হবে ?

বিনয় শব্দ করে হাসল। বলল, অবসেশনটা কাটিয়ে ওঠো দয়ী। দেখা হলেও কিছু নয়, না হলেও কিছু নয়।

আমাকে তবে তুমি বিয়ে করবেই ?

তুমি রাজি থাকলে।

কোনো কিছুতেই আটকাবে না ?

বিনয় মৃদু হেসে বলে, আমি অদৃষ্টবাদী। আটকাবে না তা কী করে বলি ? কত অঘটন আছে।

কেন তুমি আমাকেই বিয়ে করতে চাও? তুমি তো আমার প্রেমে পড়োনি।

বিনয় মাথা নেড়ে বলে। না। প্রেমে পড়া অ্যাডোলেসেন্ট মানসিকতা। আমি তা কাটিয়ে উঠেছি। তার চেয়ে অনেক বেশী জরুরী হল কমপ্যাটিবিলিটি। এই বয়সে অনেক ডেবিট ক্রেডিট কষে তবে

বিয়ের মতো গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

আমাকে নিয়ে তুমি হিসেব নিকেষ করছো ?

হুঁ। রেজাল্টটা খারাপ নাও হতে পারে।

তুমি কি রকম মেয়ে চেয়েছিলে ?

তোমার মতো।

ভেঙে বলো।

ধরো, যে মেয়ে অচেনা পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবে, অতি দ্রুত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে, যে মোটামুটি বুদ্ধিমতী এবং সাহসী।

আর কিছু নয় ?

বিনয় হেসে বলে, বয়স যখন অল্প ছিল তখন আরো অনেক বেশী চাইতাম। দারুণ সুন্দরী, বিমুগ্ধ প্রেমিকা, কট্টর সতী। অভিজ্ঞতা বাড়ার পর আর স্বপ্ন দেখি না।

তুমি কখনো কারো প্রেমে পড়োনি ?

একাধিকবার। বলে কৌতুকে মিটমিটে চোখে বিনয় দয়ীর দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু এসব আজ কী জিজ্ঞেস করছো তুমি দয়ী ? আজ কি তুমি খুব নার্ভাস ? এসব তো তোমার প্রশ্ন নয়।

দয়ী দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। বাস্তবিক আজ তার মাথা বড় ওলট-পালট। বুকে অভিমানের ঝড়। আজ সে কিছুই তার নিজের মতো করছে না। এক অচেনা দয়ী আজ তার মাথায় ভর করেছে।

ফাঁড়িতে নেমে গেল বিনয়। রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফুটপাথে। অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হল তাকে ট্যাকসির জন্য। ততক্ষণ দয়ীও গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করল। ওপাশ থেকে বিনয় মাঝে-মাঝে মৃদু হেসে হাত নাড়ছিল, এপাশ থেকে দয়ীও কলকাতার

এইসব মধ্যবিত্ত পাড়ায় এত রাতে দৃশ্যটা খুব নিরাপদ নয়। লোকে তাকাচ্ছিল, লক্ষ্য রাখছিল। অবশেষে বিনয় একটা ট্যাকসি ধরতে পারল।

বাড়িতে ফিরতে রাত হলে দয়ীকে কিছু বলার কেউ নেই। ট্যারা বসন এখন পারতপক্ষে ছেলেমেয়েদের মুখোমুখি হতে চায় না। দয়ীর মা ছিল বড়লোকের ঘরে শিক্ষিতা মেয়ে। একটা অশিক্ষিত গুণ্ডার প্রেমে পড়ার মাশুল দিচ্ছে সারা জীবন। অনেক চুরি, ডাকাতি, লোক ঠকানো, জুয়া, রক্তপাত দেখে কেমন অল্প বয়সেই বুড়িয়ে গেছে। এখন তার কিছু শুচিবাই এবং পুজোআর্চার বাতিক হয়েছে। মা নিজের মনে থাকে। কারো তেমন কোনো খবর নেয় না।

গ্যারাজে গাড়ি রেখে বাড়ি ঢুকতেই দয়ী দেখল, বৈঠকখানায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। বেশ একটু উঁচু স্বরে কথাবার্তা হচ্ছে ভিতরে। একটা গলা বাবার, অন্যটা সরিতের।

বহুকাল সরিৎ এ বাড়িতে আসে না। আজ কেন এসেছে সেটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না দয়ীর। সরিতের বা বাবার মুখোমুখি হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না দয়ীর। সে চুপি চুপি দোতলায় উঠে যেতে পারত। কিন্তু হল না পোষা অ্যালসেশিয়ানটার জন্য। দোতলার বারান্দা থেকে সেটা "হাউফ হাউফ" করে প্রচণ্ড ধমক চমক শুরু করল।

বৈঠকখানা থেকে বাবার বুলেটের মত স্বর ছিটকে এল, কে?

গেটে দারোয়ান থাকে, বাড়িতে কুকুর আছে, প্রচুর লোকজন, তবু ট্যারা বসন এখনো সন্দিহান, সতর্ক। এসব লোক জীবনে কখনো নিশ্চিন্তে সময় কাটাতে পারে না।

দয়ী খুব উদাস গলায় জবাব দিল, আমি দয়ী।

অ। ট্যারা বসন যেন নিশ্চিন্ত হল। সরিতের গলা শোনা গেল, ওকে ডাকুন না। ডেকে সামনাসামনি জেনে নিন।

ট্যারা বসন মৃদু স্বরে বলে, থাকগে। যেতে দাও। কাল সকালে বললেই হবে।

সরিৎ হঠাৎ ধমকে উঠে বলল, ইট মে বি টু লেট দেন। আপনার ছেলেমেয়েরা কে কি করবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমাদের পরিবার ইনভল্‌ভড হলে আমি ছেড়ে কথা বলব না।

সিঁড়ির গোড়ায় দয়ী একটু দাঁড়াল। একবার ভাবল, ওপরে উঠে যাবে। তারপর খুব ঘেন্না হল পালিয়ে যেতে। সে আস্তে অত্যন্ত সতেজ পায়ে এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় বৈঠকখানার পর্দাটা সরিয়ে ঢুকল।

কী ভাবে সাজালে ভাল হবে তা বুঝতে না পেরে ট্যারা বসন বৈঠকখানাটাকে প্রায় একটা যাদুঘর বানিয়ে তুলেছে। বিশাল বিশাল কয়েকটা সোফা, মেঝেয় লাল নীল ফুলকাটা কার্পেট, সামনের দেয়ালে একটা হরিণের মাথার নীচে একটা ঢালের সঙ্গে দুটো ক্রস করা তরোয়াল, পাশে ছোট্টো মাদুরের ওপর যামিনী রায়ের ঢঙে আঁকা ছবি, রবি ঠাকুরের কাস্টিং, অন্য দেয়ালে শিলং থেকে আনা ঘর সাজানো তীরধনুক, অন্তত গোটা ছয়েক ক্যালেণ্ডার, ভোজালি, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি, দেয়াল কুলুঙ্গিতে একটা গণেশ, ঢাউস বুককেসে রাজ্যের ইংরিজি বাংলা বই। ঘরে একই সঙ্গে চীনে লণ্ঠন, মস্ত ঘোমটার মতো ঢাকনা পরানো স্ট্যাণ্ডওলা আলো, স্টিক লাইট এবং মার্কারি ল্যাম্পের ব্যবস্থা। আছে পেতলের বিশাল ফুলদানী, পাথরের ন্যাংটো পরী, একটা কাশ্মীরি কাঠের জালিকাটা পার্টিশন পর্যন্ত। কী ভেবে বৈঠকখানার এক কোণে একটা নীলচে রঙের হাল-

ফ্যাসানের মুখ ধোওয়ার বেসিন পর্যন্ত লাগিয়েছে বসন। পারতপক্ষে এ ঘরে দয়ী বা তার ভাইবোনেরা ঢোকে না। তাদের আলাদা আড্ডাঘর আছে। এ ঘরে সভা শোভন করে বসনই বসে রোজ।

আগে চেককাটা লুঙ্গি পরত, আজকাল সাদা পায়জামা পরার অভ্যাস করেছে ট্যারা বসন। গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি লেপটে আছে। একটু আগেও বোধহয় লোডশেডিং ছিল। ঘরে নেভানো মোমের পোড়া গন্ধ। ট্যারা বসনের মলমলের পাঞ্জাবি এখনো ঘামে ভেজা। খোলা বুকে সোনার চেনে আঁটা বাঘের নখ। টকটকে লালচে ফর্সা রঙ, মাথার চুল পাতলা, মজবুত চেহারা। এখনো চোখের নজর যেন উড়ন্ত ছুরির মতো এসে বেঁধে। খুব গম্ভীর ভাবে দয়ীর দিকে চাইল।

দয়ী কোনোদিনই বাপকে গ্রাহ্য করে না, আজও করল না। ট্যারা বসনের ডানদিকের মস্ত সোফায় সরিৎ বসা। তার চোখমুখ থমথম করছে। দয়ীর দিকে একবার চেয়েই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে পেছনে হেলে ডোন্টকেয়ার ভঙ্গীতে মাথার চুলে আঙুল চালাতে লাগল। ঠোঁটে একটু বিদ্রূপের হাসি।

দয়ী ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেও প্রথমটায় কথা বলতে পারল না। রাগে শরীর কাঁপছিল। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল মাথা। বড় বড় চোখে খানিকক্ষণ সরিতের দিকে চেয়ে রইল। তারপর পাড়া-জানানো তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমি কাউকে বিয়ে করতে চাই না। আপনি যান, গিয়ে আপনার ভাইয়ের কান বসে বসে ভারী করুন গে। এতদিন তো তাই করছিলেন, সুবিধে হয়নি বুঝে কি আজ এ বাড়িতে হানা দিয়েছেন?

সরিৎ বোধহয় এতটা আশা করেনি। দয়ীর চিল-চেঁচানি শুনে

বোধহয় খানিকটা নার্ভাস হয়ে গেল। তোম্বা মুখ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

কিন্তু দয়ীর মাথার ঠিক নেই। সে প্রাণপণে চিৎকার করে বলছিল, লজ্জা করে না আপনার? দিদিকে সারাটা জীবন স্লো পয়জন করে যাচ্ছেন। নিজের ছেলেকে দিয়ে আমার গোপন চিঠি চুরি করাচ্ছেন। মেয়েমানুষের মতো চুকলি করে বেড়াচ্ছেন। আপনি কি ভাবেন আপনার ভাইয়ের মতো পাত্র আর হয় না, আর আমি জলে পড়েছি? আমাদের ভালোমন্দ বোঝবার জন্য আমার বাবা মা আছে, আপনি গার্জিয়ানি ফলাতে আসেন কেন? মর‍্যালিটি গিয়ে নিজের ছেলেকে শেখান আর বউকে গিয়ে বীরত্ব দেখান। বলতে বলতে দয়ী উদভ্রান্তের মতো গিয়ে সেন্টার টেবিল থেকে পেতলের ছাইদানীটা তুলে নিল হাতে। তারপর সেটা মাথার ওপর তুলে আক্রোশে বীভৎস চেড়া গলায় চেঁচাল, যান, এক্ষুনি বেরিয়ে যান। নইলে শেষ করে ফেলব।

চারদিক থেকে পায়ের শব্দ ছুটে আসছিল, টের পায়নি দয়ী। মুহূর্তে ঘর ভীড়ে ভীড়াক্কার। বহুকাল বাদে ট্যারা বসন তার শারীরিক সক্ষমতার পরিচয় দিল এক লাফে উঠে দয়ীর হাত থেকে দ্রুত হাতে অ্যাশট্রেটা ছিনিয়ে নিয়ে। তারপর জামাইয়ের দিয়ে চেয়ে বলল, এইসব লুল্লুভুল্লু আমার ভাল লাগে না। রাত হয়েছে, তুমি বাড়ি যাও।

সরিৎ গুম হয়ে বসে অপমানটা হজম করার চেষ্টা করছিল।

বাড়ির লোকেরা দয়ীকে টেনে নিয়ে গেল অন্দরমহলে। ভারী ক্লান্ত বোধ করছিল দয়ী। ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। মাথাটা আজ বড় ওলট-পালট। আজ দয়ী আর দয়ী নেই।

॥ সরিৎ ॥

বহুকাল হল মৃত্যুর ফাঁদের মধ্যে বসবাস করছে মৃন্ময়ী। শুধু একটু ইচ্ছের অপেক্ষা। ইচ্ছে যে হয় না তা নয়। কিন্তু ভয় করে, স পাপের চিহ্ন এই জীবনে ধুয়ে মুছে দিয়ে যেতে না পারলে সে সোজা নরকে যাবে। গতি হবে না, মুক্তি হবে না কোনোদিন। নইলে মরা সহজ উপায় থরে থরে তার হাতের নাগালে সাজানো। সরিৎ বহুকাল হল এই ফাঁদ সযত্নে পেতে রেখেছে তার জন্য।

ঘটনাটা ঘটেছিল সব জানাজানি হওয়ার পর। সরিৎ আলাদ শুতো। একা ঘরে শুয়ে মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠত মৃন্ময়ী। বড় বীভৎস সব স্বপ্ন। তারপর ভয়ে আর ঘুম আসতে চাইত না। এইভাবেই তার ইনসোমনিয়ার সূত্রপাত। না ঘুমোনোর বুক ছেঁড়া কষ্ট তাকে পাগল করত। কর্তব্যবোধেই সরিৎ ডাক্তার ডাকল। ডাক্তার দিল ঘুমের ওষুধ।

সরিৎ কয়েকদিনের মধ্যেই নানান ধরনের ট্র্যাঙকুইলাইজার আর কড়া জাতের ঘুমের ওষুধ সাজিয়ে দিল তার ঘরে। মৃন্ময়ী তখনো আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেনি। বোধহয় ভাবত, সময়কালে সব ঠিক হয়ে যাবে। রোজ ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতো। একদিন শোওয়ার সময় দেখে টেবিলে একটাও ঘুমের ওষুধ নেই। কে যেন সরিয়ে নিয়েছে। খুব সংকোচের সঙ্গে সে গিয়ে সরিৎকে জিজ্ঞেস করল, আমার ঘুমের বড়িগুলো পাচ্ছি না।

সরিৎ টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কী যেন লেখাজোখা করছিল। মুখ

না তুলেই বলল, আমি সরিয়ে নিয়েছি।

কেন?

সরিৎ খুব গম্ভীর গলায় বলল, অতগুলো ঘুমের ওষুধ হাতের কাছে পেয়ে তুমি যদি কোনো অঘটন ঘটাও?

মৃন্ময়ীর মাথায় সেই প্রথম বিদ্যুৎ খেলে গেল। কী বোকা সে। হাতের এত কাছে মুক্তির উপায় ছিল। সে অসহায় গলায় বলল, তাহলে কী করব?

তা জানি না। তবে বিপদের ঝুঁকিও নিতে পারি না।

আমি মরলে কি তোমার খুব ক্ষতি হবে?

সরিৎ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তা তো হবেই। পুলিশ আসবে। সন্দেহ করবে। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো ভাল নয়, মার্ডার চার্জ ঘাড়ে চাপালে দোষ কি?

শুধু সেই ভয়?

শুধু সেই ভয়।

মৃন্ময়ী সরিতের আলোছায়াময় মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে ফিরে এসে আলো জ্বেলে খুব অকপট একটা সুইসাইডাল নোট লিখে নিয়ে গিয়ে সরিতের হাতে দিয়ে বলল, এটা হলে চলবে?

সরিৎ খুব মনোযোগ দিয়ে কাগজটা পড়ল। একটু ইতস্তত করল। তারপর টেবিলের তালা খুলে টানা থেকে নিঃশব্দে সব ঘুমের ওষুধ বের করে দিয়ে দিল।

মৃন্ময়ী জানে নিজস্ব গোদরেজের আলমারির লকারে সযত্নে সেই কাগজখানা রেখে দিয়েছে সরিৎ। কাগজে কোনো তারিখ দেওয়া নেই। যেদিন ঘটনাটা ঘটবে সেদিন দরকারমতো তারিখ বসিয়ে দেবে সরিৎ।

এইভাবেই মৃন্ময়ীর মৃত্যুর ফাঁদ তৈরী হয়ে আছে আজ বহুদিন। সরিৎ আজও ঘুমের ওষুধ এনে দেয় ফুরোবার আগেই। হয়তো প্রতিদিনই অপেক্ষা করে থাকে সরিৎ। কিন্তু আজও মৃন্ময়ী তাকে মুক্তি দিতে পারেনি। বড় নরকের ভয় তার। বড় ভয়, মৃত্যুর পর হয়তো সে এক সীমাহীন ঘোর অন্ধকার জগতে ডুবে যাবে। মৃন্ময়ী তাই এই জন্মে তার পাপের স্খালন করার চেষ্টা করে। কিভাবে পাপ যাবে তা তো সে জানে না। তাই সে ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা ঠোকে, ভিখিরিদের খাওয়ায়, সাধু সজ্জন দেখলেই পায়ে লুটিয়ে পড়ার চেষ্টা করে।

তার প্রশ্রয় পেয়েই এই সাততলার ফ্ল্যাটেও ভিখিরিরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসত। আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা আপত্তি তোলায় এবং সরিৎ জানতে পারায় দারোয়ানদের ওপর কড়া হুকুম জারি হয়েছে। তবু মৃন্ময়ীর গোপন বন্দোবস্তে রোজ দুপুরে তার ফ্ল্যাটের তলায় ভিখিরিরা মজুত থাকে। ওপর থেকে মৃন্ময়ী প্ল্যাস্টিকের প্যাকেটে রুটি ভাত তরকারী ছুঁড়ে দেয় নীচে, ঠিক যেভাবে বন্যাদুর্গত এলাকায় এরোপ্লেন বা হেলিকপটার থেকে খাবার ফেলে দেওয়া হয়। অনেকরকম উপোস করে মৃন্ময়ী, হরেক ব্রত পালন করে। বহু আশ্রমে মন্দিরে গোপনে টাকা পাঠায়। পাপ স্খালন হয়েছে কিনা তা অবশ্য বুঝতে পারে না। যেদিন বুঝবে সেদিন আর এক মুহূর্তও দেরী করবে না। তবে আত্মহত্যাও নাকি ভীষণ পাপ। আত্মহত্যা করলে আত্মা অন্ধকার গ্রহসমূহে ঘুরে বেড়ায়, কোনোদিন আলোর মুখ দেখে না। সেই পাপটুকুর জন্যই যা কিছু ভয়। তবু সেই পাপটুকু স্বীকার করতেই হবে। নইলে সরিতের মুক্তি হবে কি করে? বেচারা সরিৎ! মৃন্ময়ী তো জানে সরিৎ কত ভাল! মৃন্ময়ীকে ঘৃণা করলেও

সরিৎ আজও অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক পাতায়নি। ছেলে-অন্ত প্রাণ সরিতের। সেই ছেলের যে মৃন্ময়ীর দূষিত রক্ত থেকে জন্ম তাও ক্ষমা করেছে। যে যত নিন্দে করুক সরিতের, মৃন্ময়ীই একমাত্র জানে, সরিতের মধ্যে এক মহান চরিত্রের বাস। তাকে মুক্তি দিয়ে যাবে মৃন্ময়ী। হয়তো মৃন্ময়ী মরলে সরিৎ আবার বিয়ে করবে। বেঁচে যাবে বেচারা।

ঘুমের ওষুধ খেয়ে মৃন্ময়ী ঢলে পড়ে ছিল বিছানায় মাতালের মতো। গভীর রাত্রে হঠাৎ সেই ঘুম ভাঙল। আবছা ঘরে বিছানার ধার ঘেঁষে এক ছায়ামূর্তিকে দেখতে পায় মৃন্ময়ী। ভয় বা চমকের আগেই ছায়ামূর্তি চাপাস্বরে বলে, আমি সরিৎ। ভয় পেও না।

ঘুমচোখে মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হল, সরিৎ হয়তো শেষ বোঝাপড়া করতে এসেছে। হয়তো বলবে, মৃন্ময়ী, তোমার সেই স্বীকারোক্তির কাগজখানা পুরোনো হয়ে হলদে হয়ে এল। এবার কিছু করো। মৃন্ময়ী তাই কাতর স্বরে বলল, এখনো কিছু কাজ বাকি আছে যে! এত তাড়াতাড়ি কোরো না। আর কয়েকটা দিন সময় দাও।

কী বলছ মৃন্ময়ী? এই বলে সরিৎ বহুকালের মধ্যে যা করেনি আজ তাই করল। খুব কাছাকাছি বিছানায় বসল।

এত বেশী অবাক হল মৃন্ময়ী যে, চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেল দূর রাজ্যে। সচেতন হয়ে উঠে বসল সে, সরিতের গায়ে হাঁটু লাগছিল, সরিয়ে নিল।

সরিৎ বলল, বেডসুইচ টিপো না মৃন্ময়ী। অন্ধকারই ভাল।

হ্যাঁ, অন্ধকারই ভাল। এই পোড়ামুখ দেখতে হবে না। মৃন্ময়ী বলে।

সরিৎ কথাটা গায়ে মাখল না। বলল, আমি বিয়েটা আটকাতে

চাই মৃন্ময়ী। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

মৃন্ময়ী মোটামুটি সবই জানে। ক'দিন আগে বাপের বাড়ি গিয়ে ভাসা ভাসা শুনে এসেছে, সরিৎ নাকি সপ্তাহখানেক আগে তাদের বাড়িতে গিয়েছিল দয়ী আর বিনয়ের বিয়ে আটকাতে। দয়ীর সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে থাকবে। মৃন্ময়ীর দুঃখের বোঝা বাড়াতে চায় না বলে বাপের বাড়ির লোক খুব ভেঙে কিছু বলেনি। কিন্তু ক'দিন ধরে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে সরিৎ, এর ওর তার কাছে যাচ্ছে। খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছে তাকে এবং খুব গম্ভীর। মলয় নামে সেই ছেলেটিকে বারবার টেলিফোন করার চেষ্টা করেছে সকালে এবং রাত্রে। অনেক চেষ্টায় এক রাত্রে বুঝি লাইন পেয়েছিল। কিন্তু মলয় সরিতের নাম শুনেই বোধহয় অপমানজনক কিছু বলে ফোন নামিয়ে রাখে।

মৃন্ময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার কী করার আছে?

সরিৎ অধৈর্যের গলায় বলে, তা আমিও জানি না। শুধু জানি যেমন করে হোক এ বিয়ে আটকাতে হবে।

কেন বলো তো! ওদের যদি দুজনের দুজনকে পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে তোমার আমার কী এসে যায়?

দয়ী কতটা খারাপ মেয়ে তা কি জানো মৃন্ময়ী?

মৃন্ময়ী একথায় চুপ করে থাকে।

সরিৎ একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, তোমার মোটে একবার পদস্খলন হয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি কখনো তোমাকে বেচাল দেখিনি। তোমাকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি মৃন্ময়ী, কেন তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। কিন্তু ভাল না বাসলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রতি আমার সিমপ্যাথি বেড়েছে, বাড়ছে। কিন্তু দয়ী তোমার মতো নয়। বহু পুরুষের সঙ্গ করেছে, এখনো করে।

কলকাতার কোনো হোটেলে বা বাইরে কোথাও গিয়ে রাত কাটিয়ে আসে। একে পদস্খলন বলে না মৃন্ময়ী, এ প্রায় বেশ্যাবৃত্তি। তুমি কি চাও জেনেশুনে ওকে আমাদের ফ্যামিলিতে বউ করে আনা উচিত ?

মৃন্ময়ী মাথা তুলল না, কিন্তু প্রশ্ন করল, তুমি অত জানলে কি করে ?

কানে আসে।

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বলে, কানে আসে না। তুমি ওর সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছো।

একটু কি থতমত খেল সরিৎ ? তারপর খুব স্পোর্টসম্যানের মতো বলল, নিলে নিয়েছি। বিয়ের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া দোষের নয়।

মৃন্ময়ী তবু বলে, বিয়ের কথা হওয়ার আগেও নিয়েছো। আমি জানি, তুমি আমার সম্পর্কেও খোঁজ নাও। বাবুন তোমার স্পাই।

বিরক্ত সরিৎ পট করে উঠে দাঁড়াল। রোখা গলায় বলল, আমার জীবনটা তুমি নষ্ট করেছো। যার বউ ভাল নয় তার মতো হতভাগা দুনিয়ায় দুটো হয় না। আমার জ্বালা তুমি আজও টের পাও না মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ী প্রায় নিঃশব্দে বলল, পাই। দয়ী খারাপ তাও জানি। কিন্তু বিনয় ঠাকুরপো যদি অ্যামেরিকায় ফিরে গিয়ে মেমসাহেব বিয়ে করে তাহলে সে কি দয়ীর চেয়ে ভাল চরিত্রের মেয়ে হবে ?

সেটা আমার ভাববার কথা নয়। অ্যামেরিকা আমার নাগালের বাইরে।

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বলে, এটাও তাই। ওরা বিয়ে করতে চাইলে আমাদের কিচ্ছু করার নেই।

তুমি পারো মৃন্ময়ী। তুমি দয়ীকে বোঝাতে পারো।

দয়ী কোনোদিন কারো কথায় চলে না। বাবাও পারেনি ওকে বশে আনতে।

সরিৎ আবার নরম হয়ে বেড়ালের মতো কাছে বসে বলে, তুমি জানো না, সেদিন ওদের বাড়িতে আমাকে অ্যাশট্রে ছুঁড়ে মারতে এসেছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল। আমি তোমার ভালোবাসার পাত্র না হলেও আমার অপমানে কিন্তু তোমারও অপমান।

মৃন্ময়ী মৃদু স্বরে বলে, আমার অপমান? আমার তো আর কোনো অপমান নেই!

রাগ করো না মৃন্ময়ী। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। বহুদিন বাদে আমি তোমার কাছে এসেছি।

সরিৎ একটা হাত বাড়িয়ে মৃন্ময়ীর হাত চেপে ধরল। একটু বেশীই চাপ দিল কি? খানিক আগে সরিৎ যে 'পদস্খলন' কথাটা বলেছিল সেইটে মনে পড়ল মৃন্ময়ীর। পদস্খলন! পদস্খলন! কী রকম সাধু ভাষা না? শুনলে হাসি পায়।

হাতটা একটু নিজের দিকে টানল কি সরিৎ? খুব নিবিড় গলায় বলল, বলো রাগ করোনি?

মৃন্ময়ী রাগ করেনি। তাই মাথা নাড়ল।

আমাকে সাহায্য করবে? বলে সরিৎ আরো একটু টেনে নিল মৃন্ময়ীকে। মৃন্ময়ীর অদ্ভুত অবস্থা। টানের ফলে সে বসা অবস্থা থেকে প্রায় নীলডাউন অবস্থায় এল। সরিৎ তখনো টানছে। তাই একটু ভেঙে পড়ল মৃন্ময়ী। আর ঠিক সেই অবস্থায় সরিৎ তাকে জড়িয়ে ধরে।

হয়তো আটকাতে পারত মৃন্ময়ী। কিন্তু ভাবল, হয়তো পাপ

কেটে গেছে।

সরিৎ অবরুদ্ধ গলায় বলল, জানো, কীভাবে নিজেকে এতকাল সংযত রেখেছি ? কী করে ভুলে থাকি ?

জানি।

জানো না, কিছুই জানো না। বলে সরিৎ তার সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। বহুকালের অনভ্যাস, অনেক মানসিক বাধা। তবু অন্ধ বোবা কালা দুই দেহ কিছুই মানল না।

আশ্চর্য ঘটনাটা শেষ হওয়ার পর সরিতের মাথার চুল আদরে মুঠি করে ধরে মৃন্ময়ী বলে, তুমি কিন্তু প্রোটেকশন নাওনি।

ইচ্ছে করেই নিইনি। মৃদু স্বরে বলে সরিৎ। তারপর উঠে ছেলের ঘরে চলে যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করে, কথা দিলে তো যে, দয়ীকে বুঝিয়ে বলবে !

দিলাম। বলে পাশ ফিরে শোয় মৃন্ময়ী। আজ সে ঘুমোবে না। আজ জেগে থাকতে তার কেমন লাগবে ?

অফিস কামাই করে সে যখন টেরিটিবাজারে খুঁজে খুঁজে ম্লান ও মলিন অফিস ঘরটায় পৌঁছালো তখন ভারী হতাশ হল সরিৎ। একটা হাতকাটা গোমড়ামুখো ছেলে ছাড়া অফিসে কেউ নেই। ছেলেটা প্রশ্নের জবাবে বলল, ওঁর আসার কোনো টাইম নেই।

একটু বসব ?

বসুন।

সরিৎ বসে থাকে। সে নিজে বিরাট চাকরি করে। ঝকঝকে

তকতকে তার নিজের সাহেবী অফিস। এই ঘরটার মতো নোংরা ময়লা দমবন্ধ করা পরিবেশে সে বহুকাল ঢোকেনি। ঘরটাই যেন তার হতাশাকে দ্বিগুণ করে দিল। মন বলছে, এখানে তেমন কিছু সুবিধে হবে না।

কিন্তু সরিৎও সহজে ছাড়বে না। দয়ী আর বিনয় হয়তো কাল পরশুই রেজিস্ট্রি করবে। বিনয় কিছুতেই শুনল না। এবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে সরিৎ। মলয়কে নিয়ে সে হাজির করবে বিনয়ের মায়ের কাছে।

ফোনে তাকে মলয় বলেছিল, আপনি এত স্টুপিড কেন? বলেই ফোন রেখে দিয়েছিল। কথাটা কেন বলেছিল তা এখনো ভাল বুঝতে পারছে না সরিৎ।

মনের ধর্মই হল সে এক জায়গায় স্থির থাকে না। এক চিন্তা থেকে অদ্ভুত গলিঘুঁজি দিয়ে অন্য সব চিন্তায় ঘুরে বেড়ায়। সরিৎ ভাবতে ভাবতে গত রাত্রির অদ্ভুত ঘটনাটিতে নিবদ্ধ হল। সহজে নড়ল না সেখান থেকে। এক বিন্দু ভালবাসাও সে কাল বোধ করেনি মৃন্ময়ীর জন্য। আগে থেকেই ঘটনাটা ছক করে রেখেছিল। বহুকাল ধরে শরীরের আনন্দ থেকে বঞ্চিত মৃন্ময়ীকে সেই দুর্লভ আনন্দ দিয়ে বশ করবে। ঠিক ছক মতোই ঘটেছিল সব। ঘামে ভেজা সেই দেহের নোনতা স্বাদ জিভে লাগতেই ঘেন্নায় রী-রী করেছিল শরীর, মনে হয়েছিল অপরের উচ্ছিষ্ট এই শরীর, অন্যকে দেওয়া এর হৃদয়। তবু যখন দুটি দেহ আনন্দের চূড়ায় ক্ষণেক অবস্থান করেছিল তখন ইতিহাস মুছে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি এখনো একটু উত্তপ্ত করে তোলে তাকে। এক সময়ে তার ধারণাই জন্মেছিল, তার আর কামস্পৃহা নেই। ছিলও না। সে ভেবেছিল, বার্ধক্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে

সে। জড়ভরত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা তো নয়। এই নোংরা অফিস ঘরে বসে সে সিদ্ধান্ত নিল, ভাল নাই বা বাসলাম, মাঝে মাঝে ভোগ করতে দোষ কি ?

খুব আচমকাই একটা দীর্ঘ মানুষ সামনে এসে দাঁড়াল। কোন শব্দ করেনি, করলেও শুনতে পায়নি সরিৎ। রুঠা লাবণ্যবর্জিত মেদহীন শক্ত চেহারা, বাঁ পাশে ফাইবার গ্লাসের ক্র্যাশ হেলমেট ধরে আছে, কোমরে চওড়া বেল্ট, পরনে জীনস, কোমরে গোঁজা নীল রঙের গেঞ্জি শার্ট। হট করে দেখলে মনে হবে বুঝি কোনো ইজরায়েলী কম্যাণ্ডো।

সরিৎ সামান্য চমকে উঠেছিল। লোকটা ক্রূর এবং স্থির দৃষ্টিতে মেপে নিচ্ছিল তাকে। তারপর ভারী ও ভাঙা ভীষণ পরুষ গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি ?

আমি দয়াময়ীর জামাইবাবু। সরিৎ।

ওঃ। বলে হেলমেটটা সাবধানে টেবিলে রেখে ওপাশের চেয়ারে বসল মলয়। হাতকাটা লোকটাকে হুকুমের স্বরে বলল, পুণ্য দু কাপ চা।

সরিৎ খুব ভাল করে মলয়কে দেখছিল। বাঙালী মেয়েরা আজকাল এরকম খুনে ডাকাতদের মতো চেহারার লোককেই বেশী পছন্দ করছে নাকি ?

মলয় হাঁটু তুলে টেবিলের কানায় ঠেস দিয়ে রাখল। তারপর বিনা ভূমিকায় বলল, আপনার ভাইকেই দয়ী বিয়ে করতে চাইছে বুঝি ?

হ্যাঁ।

ফোনে আপনাকে স্টুপিড বলেছিলাম বলে দুঃখিত। কিছু মনে

করবেন না। গত কয়েক দিন বিজনেসের ব্যাপারে খুব ডিস্টার্বড আছি। আমি আবার একটু শর্ট টেম্পারড।

সরিৎ মৃদু স্বরে বলল, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। কারণ, আমি স্টুপিড নই। দ্বিতীয় কথা আমার প্রবলেমটা এত বেশী ইম্পর্ট্যান্ট যে এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।

মলয় ভ্রূ কোঁচকাল বটে কিন্তু মাথা নেড়ে জানাল যে, সে বুঝেছে।

সরিৎ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, আমি ফোনে আপনাকে সেই প্রবলেমটার কথাই বারবার বোঝাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি বিরক্ত হয়েছিলেন, আমার তবু না বলে উপায় নেই।

মলয় হাত তুলে বলল, ব্যস ব্যস। প্রবলেমের কথা শুরু হলে সহজে শেষ হবে না। আমার হাতে অত সময় নেই। সরি।

পুণ্য খুব অল্প সময়েই চা করে নিয়ে এল। ভাল চা। সরিৎ চুমুক না দিয়েও গন্ধ পাচ্ছিল। শান্ত স্বরেই সে বলল, আমি তবু আপনার কো-অপারেশন চাই।

ভ্রূ কুঁচকে মলয় বলে, ওদের বিয়ে আটকানোর জন্য আপনি কত দূর যেতে রাজি?

যত দূর যাওয়া যায়।

মলয় টেবিলের ওপর তার চওড়া হাড়ের মজবুত হাতখানা বাড়িয়ে বলল, তাহলে ফিফটি থাউস্যাণ্ড রুপিজ ডাউন করুন। বিয়ে আমি আটকে দেবো।

টাকা? সরিৎ খুব অবাক হয়। সে এতটা আশা করেনি।

মলয় সামান্য হেসে বলে, ব্ল্যাকমেল নয়। এই টাকায় আপনি একটা বাঙালী প্রোডাকশনের শেয়ার কিনছেন। ডিভিডেণ্ড পাবেন।

শুনুন মশাই, দয়ী বা আপনার প্রবলেম নিয়ে ভাববার সময় আমার সত্যিই নেই। আই অ্যাম এ বিজি ম্যান। আপনার মতো মস্ত ইঞ্জিনিয়াররা যেমন মাসকাবারে মোটা মাইনে পায় আমি তেমন পাই না। এই টেরিটিবাজারে আমাকে মস্ত বড় বড় মহাজনদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। বিগ গানস আর আফটার মি। আমাকে তাই সব সময়ে সতর্ক থাকতে হয়। এক-চুল ভুল হলে ওরা ডুবিয়ে দেবে। সুতরাং, আপনার জন্য কিছু করতে হলে আপনাকেও আমার জন্য কিছু করতে হবে।

বক্তৃতাটা শান্তভাবেই শোনে সরিৎ। চায়ে চুমুক দেয় এবং মুখ তুলে বলে, আমার অত টাকা নেই।

মলয় মাথাটা একধারে কাৎ করে বলে, আপনি দেড় লাখ টাকায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন না? সব খবর রাখি।

দেড় লাখ নয়, সোয়া লাখ। মাত্র থার্টি পারসেণ্ট ক্যাশ ডাউন করতে হয়েছে। তবু তাইতেই আমি প্রায় ব্যাংকরাপ্ট।

মলয় চা শেষ করে আখাম্বা দীর্ঘ শরীরটাকে পাক খুলে দাঁড় করায়। ক্র্যাশ হেলমেটটা বগলে নিয়ে বলে, তাহলে আমার কিছু করার নেই জামাইবাবু। আমি হঠাৎ বুঝতে পেরেছি কলকাতার ইকনমিটা আমাদের হাতে নেই। সেটা ফিরিয়ে আনাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। কাজটা আমাকে করতেই হবে।

সরিৎ লোকটার ওপর বিরক্ত হয়। বাস্তবিক একে প্রথম দর্শনে ইজরায়েলী কম্যাণ্ডো ভাবাটা ভুলই হয়েছিল। সেও ভ্রূ কুঁচকে বলল, এগুলো কোনো সিরিয়াস কথা নয় মলয়বাবু। পঞ্চাশ হাজার টাকাটাও কোনো প্রবলেম নয়। টাকা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক আছে, অজস্র মানিটারি ফাণ্ড আছে। আজকাল টাকার সোর্সের কোনো

অভাব নেই। আপনি চাইলে আমি গ্যারান্টার দাঁড়িয়ে টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। নাটক করার কোনো দরকার নেই।

মলয় খুব ধীরে ধীরে বসল। তারপর খুব ধীর এবং গম্ভীর গলায় বলল, ঠিক আছে। বলুন।

॥ রুকু ॥

সন্তোষপুরের মেয়েটিকে এক রবিবারে গিয়ে দেখে এল রুকু। দেখার অবশ্য কোনো মানেই হয় না। সঙ্গে বড় মামা ছিল, পিসে-মশাই ছিল, পিসতুতো এক দিদি ছিল। আসলে দেখল তারাই। রুকু সেকেলে মানসিকতায় ভোগে। লজ্জায় সে মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকায়নি। এক আধ পলক দেখেছিল। মনে হল, ঢ্যাবঢেবে ফর্সা বোকা চেহারা। মুখখানা মন্দ নয়, তবে বেশ বয়সের ছাপ আছে। এটুকু দেখেই জানালা দিয়ে বাইরে সারাক্ষণ চেয়ে ছিল সে। মেয়েটিকে অবশেষে অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হল, আর তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার টাকা নগদের কথা পেড়ে ফেলল বড় মামা। সেই সঙ্গে একটা স্কুটারের দামও। তবে স্কুটারটাকে সাসপেনস অ্যাকাউন্ট ধরলে পাঁচ হাজার রইল অনড় অটল হয়ে। রুকুর কোনো মতই চাওয়া হয়নি আগাগোড়া।

রুকু কেবলই ক'দিন ধরে ভাবছে, সে কি বাস্তবিক ব্যক্তিত্বহীন? ন্যায়-অন্যায়ের জোরালো মতামত কি নেই তার? সে নগদের ব্যাপারটাও কিন্তু কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। বউভাতের বিপুল একটা খরচ আছে। সেটা আসবে কোথেকে? বোনের বিয়ের

ধারও শোধ হয়নি এখনো। নগদ নিলে আর কোনো অসুবিধে থাকে না। মেয়ের উকিল বাপ তাতে অরাজিও নয়। স্কুটারের কথাও ও পক্ষ ভাবছে। চারশো সি সি হোণ্ডা মোটরসাইকেলের কথা দূরে থাক তার যা রোজগার তাতে নিজের পয়সায় স্কুটার কেনার কথাও সে ভাবতে পারে না। শ্বশুর যদি দেয় তো কলকাতার এই অসহ্য ট্রাম বাস এড়িয়ে অফিস আর টিউশনিগুলো নির্বিঘ্নে সারতে পারবে। তা ছাড়া, নিজস্ব যে কোনো রকম স্বয়ংক্রিয় একটা যান থাকা খানিকটা সমৃদ্ধির পরিচয়ও তো! রুকু বহুকাল ধরে বড় গরীব। মানুষকে দেখানোর মতো কিছু নেই তার। মনটা মাঝে মাঝে লোভী হয়ে উঠছে।

এই সব টানাপোড়েনের মধ্যেই সে একদিন দয়ীর টেলিফোন পেল, শোনো, কাল আমাদের বিয়ে।

তোমার বিয়ে?

তবে কার?

না, জিজ্ঞেস করছি, কার সঙ্গে?

দয়ী খুব হাসল। বলল, ভয় পেও না। ঠিক লোকের সঙ্গেই বিয়ে। বিনয়। আপাতত রেজিস্ট্রি হচ্ছে। সপ্তাহখানেক বাদে সোস্যাল ম্যারেজ। তুমি সাক্ষী দিতে আসতে পারবে?

আসব দয়ী।

অফিসের পর তাহলে সোজা আমাদের বাড়িতে চলে এসো। কাউকে ব্যাপারটা বলো না।

কাউকে বলতে কাকে বোঝাচ্ছো? মলয় কি?

দয়ী একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, মলয় বা আর কাউকেই নয়।

বলব না দয়ী।

পরদিন একটু সেজেগুজেই অফিসে গেল রুকু। কিন্তু মনটা ভাল ছিল না। দয়ীর জন্যই মনটা খারাপ। বেচারা বড্ড কর্মফল ভোগ করছে। ভয় দুশ্চিন্তা অনিশ্চয়তা কত কি ওর পিছনে লেগেছে।

অফিসের পর লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে মিনিবাসে উঠে পড়ল সে। সাধারণত ওঠে না। বেশী পয়সা লাগে এমন যানবাহন তার কাছে অস্পৃশ্য। তবু আজ দয়ীর বিয়ে বলেই বেহিসেবী হওয়া গেল।

বাইরে থেকেই আজ দয়ীদের বাড়িটাকে শ্রীহীন দেখাচ্ছিল। কেমন বিবর্ণ, রঙচটা, বিকেলের পাঁশুটে আলোয় কিছুটা ম্লান। দয়ীকে আজ সে বলবে, বাড়িটার কলি ফেরাও না কেন? তোমার বাবার তো কত টাকা!

দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে যেতে সে এক নাগাড়ে দয়ীদের প্রকাণ্ড অ্যালসেসিয়ানটার বীভৎস ডাক শুনল। আজ যেন বড় হিংস্র হয়ে ডাকছে। এ বাড়ির সে প্রায় চেনা লোক। আগে প্রায়ই আড্ডা মারতে আসত, আজকাল আসা-যাওয়ায় ভাঁটা পড়েছে কিছুটা।

দয়ীদের একটি অল্পবয়সী ঝকঝকে চেহারার স্মার্ট চাকর আছে। ঘাটাল থেকে সে কলকাতায় এসেছিল ফিলমে নামবার জন্য। চানস পায়নি বলে ট্যারা বসনের সাগরেদী করছে। কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে সে বম্বে যাবে বলে ঠিক ছিল। সেই যাওয়াটা এখনো হয়ে ওঠেনি। দোতলার বারান্দায় উঠতেই সেই চাকর সুমন্তকুমারের সঙ্গে দেখা সুমন্তকুমার নামটা বোধ হয় সে নিজেই রেখেছে। এ বাড়ির সবাই তাকে ফ্যালা না কী যেন একটা নাম ধরে ডাকে। সে কিন্তু নাম জিজ্ঞেস করলেই বলে, শ্রীসুমন্তকুমার। পদবী বলে না, কারণ ফিলম স্টারদের নাকি পদবী বলার রেওয়াজ নেই।

সুমন্তকুমার রুকুকে দেখেই হাসল। যখন তখন হাসে। বোধ হয় ওর সাদা পোর্সিলিনের মতো ঝকঝকে দাঁতগুলো লোককে দেখানোর জন্যই ঐ দেখনহাসি। বলল, যান মেজদি ঘরেই আছেন।

ঘরেই ছিল দয়ী। তবে বিষণ্ণবদনা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে একটা টুলে বসা। উল্টোদিকে একটা বেতের চেয়ারে কর্মঠ চেহারার এক ভদ্রলোক।

দয়ী মুখ তুলে বলল, তোমাকে আজ ফোন করতে ভুলে গেছি। আসলে রেজিস্ট্রিটা আজ হচ্ছে না। তুমি কষ্ট করে এলে।

রুকু অচেনা মানুষ দেখে অস্বস্তিকর কোনো প্রশ্ন করতে গেল না। শুধু বলল, তাতে কি? আসাটা তো হল। অনেকদিন আসা হয়নি।

বোসো রুকু। এই হচ্ছে বিনয়।

নমস্কার-টমস্কার সেরে রুকু আর একটা বেতের চেয়ারে বসে বলল, আজ হচ্ছে না তো হচ্ছে কবে?

দয়ী মাথা নেড়ে বলল, কিছু ঠিক নেই। রুকু, তুমি একবার মলয়ের সঙ্গে দেখা করবে?

নিশ্চয়ই।

অস্বস্তি বোধ করলে যেও না। এবার হয়তো ও তোমাকে আরো অপমান করবে

রুকু মৃদু হেসে বলে, ওসব আমার অভ্যাস আছে। মলয় আমার অনেক পুরোনো বন্ধু। কিন্তু ও কি করেছে বলো তো!

দয়ী একটু হাসল। বিষণ্ণতায় মাখানো হাসি। তারপর বলল, সে এক ভারী ছেলেমানুষী কাণ্ড। বোধ হয় জামাইবাবুই ওকে এ বুদ্ধি দিয়েছে। মলয় শয়তান হলেও মীন ছিল না কখনো। ও একটা ফলস ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রোডিউস করেছে। তাতে আমার আর

ওর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সই। মনে হয়, কাউকে আমি বলে সাজিয়ে নিয়ে গেছে রেজিস্ট্রারের কাছে।

ফলস সার্টিফিকেট? তাতে তোমার বিয়ে আটকায় কিসে?

দয়ী অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলে, আটকায় না সে তো জানি। কিন্তু ও আবার পুলিশটুলিশকে ইনফর্ম করেছিল। তারা এনকোয়ারিও করে গেছে। সইটা যে আমার নয় সেটা প্রমাণ হবে আদালতে। অনেকটা সময় নেবে। বুঝতেই তো পারছ, আমার পাসপোর্টের ঝামেলা আছে। আমার ম্যারেজ সার্টিফিকেটে কোনো রকম গোলমাল থাকলে চলবে না। তাই আজ রেজিস্ট্রি করা যাচ্ছে না।

রুকু স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। খুব অবাক হল না। মলয়কে দয়ী মীন বলে গাল দিল। হয়তো কথাটা ঠিক নয়। মলয়কে কোনোদিনই খুব ক্ষুদ্র হতে দেখেনি রুকু। এ কাজটা হয়তো করেছে দয়ীকে আটকানোর অন্য কোনো উপায় নেই দেখে।

বিনয় নামক মানুষটি যদিও এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি তবু দু-একবার তাকিয়েই রুকু লোকটাকে পছন্দ করে ফেলল। ধীর গম্ভীর বিবেচক মানুষ। কোনো উত্তেজনা রাগ বা হতাশার ভাব নেই। পোড় খেয়ে খেয়ে ভাবাবেগ কমে গেছে।

বিনয় কি একটু ভাবছিল। রুকুর দিকে চেয়ে বলল, আমার ছুটি ফুরিয়ে আসছে। হাতে একদমই সময় নেই।

রুকু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি আজই মলয়ের কাছে যাচ্ছি।

দয়ী ধমক দিয়ে বলে, চা খেয়ে যাও। অফিস থেকে এসেছো না?

রুকু বসে পড়ে।

বিনয় নরম স্বরে বলে, মলয়বাবুকে তাঁর অফিসে পাওয়া যায়নি।

আজ সারা দিন আমরা ফোনে চেষ্টা করেছি।

রুকু সংক্ষেপে বলে, আমি ওর বাড়ি চিনি।

চা আর খাবারের একটা ট্রলি ঠেলে ঘরে আনল সুমন্তকুমার। সঙ্গে দয়ীর দিদি মৃন্ময়ী। এই মহিলাকে আগেও কয়েকবার দেখেছে রুকু। খুবই অসুখী চেহারা। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক। কখনো বাইরের লোকের সামনে বোরোতেন না। রুকু শুনেছিল মহিলা মানসিক অপ্রেশনে ভুগছেন। আজ কিন্তু সেই বিমর্ষতা বা অস্বাভাবিকতা কিছুই দেখতে পেল না রুকু। বরং বেশ সুন্দর ও চটপটে দেখাচ্ছিল। সুমন্তকে বললেন, তুই যা, আমি দিচ্ছি। বলে চটপটে হাতে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলেন, চা বানালেন। রুকু অবাক। যাওয়ার সময় উনি দয়ীর কানে কানে কী যেন একটু বললেন। দয়ী বিরক্তি প্রকাশ করল তাতে।

মৃন্ময়ী চলে গেলে দয়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, জানো রুকু, এই বিয়েটার মূলেই ছিল দিদি। এখন কি করে যেন জামাইবাবু দিদিকেও হাত করে ফেলেছে। দিদি আমাকে রাতদিন বোঝাচ্ছে, এই বিয়ে করা আমার উচিত নয়। কী বিরক্তিকর বলো তো!

রুকু কথা খুঁজে পায় না। যত যাই হোক এসব তো দয়ীর পারিবারিক ব্যাপার।

চা খেয়ে রুকু ওঠে এবং অনভিপ্রেত কাজটি করার জন্য বেরিয়ে পড়ে।

ট্রাম পাল্টে পাল্টে খিদিরপুরে আসতে অনেকটা সময় গেল। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। মলয়দের বিশাল পুরোনো বাড়িতে পৌঁছে ভিতরে ঢুকবার আগে সে গ্যারাজ ঘরটায় উঁকি দিল এবং আবছায়ায় বিশাল ভয়ংকর চেহারার মোটরসাইকেলটা দেখতে

পেল। এত দামী জিনিস তার হবে না বটে, কিন্তু শ্বশুরের দৌলতে স্কুটারটা হতে পারে। কলকাতার রাস্তায় ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াবে রুকু। বড় লোভ।

মলয় বাথরুমে। স্নান করছে। চাকর বসবার ঘর খুলে পাখা চালিয়ে বসিয়ে রেখে গেল তাকে। মলয়ের এই নিজস্ব বসবার ঘরে সময় কাটানোর মতো কোনো রঙীন ছবিওলা ম্যাগাজিন নেই। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে খুব সিরিয়াস ধরনের রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা। গূঢ় দর্শন শক্ত সামাজিক প্রবন্ধ বা অর্থনৈতিক বই। মলয় কোনোদিনই হালকা পলকা কিছু পড়ে না। কথা বললেই বোঝা যায়, ওর পড়াশুনো অতীব গভীর। মলয় বন্দুক পিস্তল নাড়াচাড়া করেছে বটে, কিন্তু রুকু জানে মলয়ের আসল জোর এইখানে। পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব তাকে বন্ধুমহলে প্রায় অপরাজেয় করে রেখেছে। মলয় কোনো বিষয়েই কখনো কারো কাছে হারেনি।

বসে বসে রুকু বড় হতাশা বোধ করছিল। সে জানে, মলয়কে কোনো বিষয় বোঝানো কত শক্ত। বরং মলয়ই মানুষের পুরোনো বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা ভেঙে দিয়ে নতুন কিছুর বীজ বুনে দেওয়ার কাজ করে এসেছে এতকাল। এক সময়ে তারাও কি মলয়ের প্রভাবে খানিকটা নকশাল হয়ে যায়নি?

খুবই দামী এক সাবানের গন্ধ ছড়িয়ে আচমকা ঘরে এল মলয়। পরনে পাজামা, খালি গা। চুলগুলো হাত দিয়ে পাট করা। রুকুকে দেখে বিন্দুমাত্র অবাক না হয়ে বলল, হ্যালো মাস্টারবেটার।

রুকুর মাথা আজ খুব ঠাণ্ডা। সে জানে অপমানিত বোধ করে নিজেকে নিয়ে মনে মনে ব্যস্ত হয়ে পড়লে মলয়ের সঙ্গে যুক্তির

লড়াইয়ে এঁটে ওঠা অসম্ভব। কূট দাবার লড়াইয়ে প্রথম চালটার কথাই ভাবছিল রুকু। কিভাবে ওপেন করা যায়।

মলয় সোফায় বসে সেন্টার টেবিলের ওপর লম্বা পা দুখানা মেলে দিয়ে বলল, সোজা দয়ীর বাড়ি থেকে আসছিস তো! মুখ-চোখ অত চোরের মতো কেন? বলতে ভয় পাচ্ছিস?

গভীর একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে রুকু। আর যাই হোক দয়ীর ব্যাপারটা মলয়ের মনের মধ্যে খুব যে গভীর নয় তা এক ঝলকেই বুঝতে পারে সে।

সতর্কভাবে রুকু বলে, যে ফলস ম্যারেজ সার্টিফিকেটে সই করেছে সেই মেয়েটা কে?

মলয় একটু পা নাচিয়ে বলে, তার কাছে এখুনি ছুটবি বুঝি? লাভ নেই। সে মরে গেলেও স্বীকার করবে না যে, তারই এই কাজ।

রুকু মলয়কে নরম করার জন্যই বলল, দেখ মলয়, আমি জানি তোর সঙ্গে লড়া মানে পাহাড়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। আমার ক্ষমতা অত নয়।

মলয় হেসে বলে, অয়েল মাস্টার।

রুকু একটু থতিয়ে যায়। তারপর বলে, তোকে অয়েল দিয়ে যে লাভ নেই তা আমার চেয়ে বেশী কে জানে। বিশ্বাস কর, অয়েল দিচ্ছি না।

মলয় ছাদের দিকে চেয়ে ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে বলে, অয়েল বা কমপ্লিমেণ্ট যাই হোক, তোর আদত কথাটা ঝড়াক করে বলে ফেল।

দয়ীকে ছেড়ে দে মলয়। ও তো গিনিপিগ নয় যে, ওর ওপর একসপেরিমেণ্ট চালাবি। বিনয়কে বিয়ে করতে না পারলেও ও অন্য কাউকে বিয়ে করবে। তোকে করবে না।

মলয় শান্ত কিন্তু গভীর এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মৃদু হেসে বলে, সেই অন্য কেউটা কে ? তুই নয় তো ?

স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে রুকু। বুকটা হঠাৎ উথাল পাথাল করে ওঠে অভিমানে। সে কোনো দিন এই অসম্ভব কথাটা ভাবেও নি। যদিও ঠাট্টা তবু তার দুর্বল জায়গায় বড় ঘা লাগল। এই ঠাট্টাটা মলয়ের অন্তত করা উচিত হয়নি। সে যে গরীব তা অহরহ ঢের বেশী টের পায় সে নিজেই। ধনী বান্ধবীরা যাতে কোনোদিন তাকে ল্যালা না ভাবে তার জন্য কত গা বাঁচিয়ে চলেছে সে। আসলে তো এই সব পয়সাওলা ঘরের ছেলেমেয়েরা তার প্রকৃত বন্ধু নয়। এরা একদিন নিজেদের সমাজে চলে যাবে, সে পড়ে থাকবে মধ্যবিত্তের গণ্ডীতে।

রুকু মৃদু স্বরে বলে, আমাকে এখনো রেশনের মাপা খাবারে সংসার চালাতে হয় মলয়। টিউশানি করে টাকা আনতে হয়। আমি স্বপ্ন দেখি না।

মলয় তেমনি হাসি মুখে বলে, অল মাস্টারবেটারস আর ড্রিমারস।

রুকু আরক্ত মুখে চেয়ে থাকে। চালে ভুল হচ্ছে। তাকে নার্ভাস করে দিচ্ছে মলয়।

মলয় আবার সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলে, ট্যারা বসনের অনেক টাকা হয়েছে, না ? উঁচুতলার সমাজে ঢোকার পাসপোর্ট পেয়ে গেছে বুঝি ?

ট্যারা বসন যে দয়ীর বাবার নাম তা জানত না রুকু। অবাক হয়ে বলে, ট্যারা কী বললি ? কার কথা বলছিস ?

দয়ীর বাবা। বাগমারির থার্ড গ্রেড গুণ্ডা ছিল। তোকে তো বলেছি। ওয়াগন ভাঙত, ডাকাতি করত। ভয়ে পালিয়ে এসে

টালিগঞ্জে ঢুকেছে। তার মেয়েকে যদি তুই বিয়ে করিস তবে সেটা ওর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি, বুঝলি গাড়ল? নিজেকে অত গরীব গরীব ভাবাটা আর এক ধরনের মাস্টারবেশন, তা জানিস?

রুকু আবার নিজের মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করে। তারপর খুব স্বাভাবিক স্বরে বলে, তা হতে পারে। তবে দয়ীর জন্য আমার কোনো ব্যক্তিগত ইন্টারেস্ট নেই।

মলয় হঠাৎ লম্বা পা দু'খানা টেবিল থেকে নামিয়ে সোজা হয়ে রুকুর দিকে চেয়ে বলে, কেন নেই? দয়ীর বাবা কি তোকে পাঁচ হাজার টাকা নগদ আর একটা স্কুটার দিতে পারবে না? চেয়ে দেখিস, ঠিক পারবে।

রুকুর প্রথমটায় মনে হল সে ভুল শুনছে। তারপরই বুঝতে পারল তা নয়। বিস্ময়ে পাথর হয়ে যাওয়া যাকে বলে তাই হয়ে গেল রুকু। এ সব কী বলছে মলয়? পাঁচ হাজার টাকা! স্কুটার!

বাড়ির চাকর ট্রেতে দু গ্লাস ঠাণ্ডা বীয়ার নিয়ে এল। সঙ্গে নোনতা বিস্কুট। মলয় একটা গ্লাস তুলে একটা চুমুক দিল। বীয়ারের ফেনা ঠোঁট থেকে জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে বলল, সন্তোষপুরের মেয়েটির বাবা তোকে যা দিতে পারে দয়ীর বাবা তার চেয়ে ঢের বেশী দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে ট্যারা বসনকে ঝেঁকে নিতে জানা চাই। অ্যাপ্রোচ করে দেখ না।

রুকু বড় একটা মদ খায় না। একটু নীতিবোধের বাঁধন ছিল। তবে আসল কারণ অর্থনৈতিক। মদের বড় দাম! অভ্যাস হয়ে গেলে বড় কষ্ট পেতে হবে। এখন অবশ্য বীয়ারের গ্লাসটা সে গভীর তেষ্টায় তুলে নিয়ে এক চুমুকে অর্ধেকটা মেরে দিল। তারপর তোম্বা মুখ করে বসে রইল চুপচাপ। কিছু বলার নেই। তার পরিবারের বাইরে

কাকপক্ষীও এই খবর জানে না। কিন্তু মলয় জানল কি করে? মলয়ের চোখ কেন সব সময়ে তার সব কিছু দেখতে পায়?

মলয় বীয়ারটা খুব সামান্য খেয়ে রেখে দিল। তারপর বলল, আমি ডিটেকটিভ বা থটরিডার নই রুকু। তোর বড় মামার সঙ্গে একদিন ডালহৌসিতে দেখা হয়েছিল। উনিই খুব আনন্দের সঙ্গে খবরটা দিলেন। বললেন, মাইয়াডাও চমৎকার, ফেমিলি চমৎকার, দিব থুইব অনেক। পাঁচ হাজার নগদ, স্কুটার, আরো কত কী!

রুকু লজ্জায় কিছুক্ষণ তাকাতে পারল না। তারপর কথা বলতে গিয়ে দেখল গলাটা ফ্যাসফ্যাস করছে। বলল, ও সব দাবিদাওয়া আমি করিনি।

মলয় ডান পাটা তুলে চাপা গলায় বলল, এক লাথি মারব শালা। দাবিদাওয়া তোমার নয় তো কার? ভূতের পিসির? সব শালাই বিয়ের পণের ব্যাপারে রেসপনসিবিলিটি শিফট করতে চায়।

রুকু বীয়ারের তলানিটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে খেয়ে নেয়।

মলয় ক্রুর চোখে চেয়ে ছিল। বলল, যে কটা ইকনমিক ক্রাইম আছে পণ নেওয়াটা তার মধ্যে একটা, তা তুই জানিস? ক্রাইম করছিস কর, কিন্তু ফের কোনোদিন মর‍্যালিটির কথা যদি বলবি তবে মুখ ভেঙে দেবো।

মলয় তার চাকরকে ডেকে রুকুকে আর এক গ্লাস বীয়ার দিতে বলে। রুকু আপত্তি করে না।

মলয় ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, দয়ী কী বলল?

রুকুকে মলয় অতি দক্ষতার সঙ্গে আবার রংফুটে ফেলে দিয়েছে। আত্মগ্লানিতে ডুবে বসেছিল সে। দয়ীকে নিয়ে এক ফোঁটাও ভাবছে না। প্রশ্নটার আলগা জবাব দিল, খুব ভেঙে পড়েছে।

মলয় হেসে বলে, আমিও তাই চাইছি।

তুই কি মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাস মলয় ?

মলয় মাথা নেড়ে বলে, আই অ্যাম নট এ স্যাডিস্ট। বলে একটু ফিচেল হাসি হেসে ফের বলল, দয়ী তোকে কখনো বলেনি যে, আমি হোমোসেকস্যুয়াল ?

রুকু নাড়া খায়। একটু চমকে ওঠে। বলে, না তো !

হয়তো বলেছে, কিন্তু সেটা আমাকে বলার সাহস তোর নেই।

মলয় সবই জানে। তাই রুকুর কিছু বলার ছিল না। চুপ করে রইল। মলয় জিব আর টাকরায় চুক-চুক করে একটা আফশোসের শব্দ তুলে বলে, তুই এত কমজোরী, তবু দয়ী যে কেন তোকেই তার রক্ষাকর্তা বলে ঠাউরেছে সেটাই রহস্য।

রুকু মাথা নেড়ে বলে, আমি দয়ীর রক্ষাকর্তা নই। দয়ী মোটেই আমাকে তা মনে করে না।

কথাটায় কান না দিয়ে নিজের কথারই জের টেনে মলয় বলে, আর তুইও কেন যে ওর হয়ে লড়ে যাচ্ছিস তাই বা কে বলবে ! আর ইউ ইন লাভ ?

রুকু দ্বিতীয় বীয়ারের গ্লাসও শেষ করেছে। একটু রিমঝিম করছে মাথা। তবু কথাটা মাথায় সেঁধোলো, খুব ভদ্র গলায় সে বলল, ওসব কেন বলছিস ? দয়ী বিনয়বাবুর সঙ্গে অলরেডি এনগেজড।

এনগেজমেণ্ট আর ভালবাসা তো এক জিনিস নয়। যদি দয়ীর প্রতি তোর দুর্বলতা থেকে থাকে তো বল তোর জন্য আমি দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিতে রাজি। যদিও জানি দয়ী একটা অত্যন্ত বাজে ফ্যামিলির থার্ড গ্রেড মেয়ে তবু তোর মামলা হলে আমি ছেড়ে দেবো।

রুকু একটু রুখে উঠে বলে, বাজে কথা বলবি না।

তুই তো চিরকালের গাড়ল, তাই হয়তো বুঝতে পারছিস না যে, দয়ীকে তুই ভালবাসিস। কিংবা হয়তো পাঁচ হাজার টাকা নগদ আর স্কুটারের লোভে তোর মাথা বিগড়ে গেছে বলে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছিস না।

অস্ফুট স্বরে আর এক গ্লাস বীয়ার চাইল রুকু। সে জানে পৃথিবীজোড়া লক্ষ লক্ষ মাস্টারবেটার আছে, হাজার হাজার লোক পণ নিয়ে বিয়ে করছে। তারা সবাই মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ভোগে না। কিন্তু রুকু ভোগে। প্রতি মুহূর্তে সে কেন নিজেকে নিয়ে এত সংকোচের সঙ্গে বেঁচে আছে? যদি সে এসব ব্যাপারকে গ্রাহ্য না করত তাহলে মলয় এ লড়াই এত সহজে জিততে পারত না।

অনভ্যাস এবং পরিস্থিতির বিরুদ্ধতার দরুণ উত্তেজনায় রুকু তৃতীয় গ্লাসটাও প্রায় এক চুমুকে শেষ করল। তারপর হঠাৎ তার মনে হল, পৃথিবীতে যাই ঘটুক তাতে তার কিছু এসে যায় না। সে মুখ তুলে সোজাসুজি মলয়ের দিকে চেয়ে বলে, ফলস ম্যারেজ সার্টিফিকেট ধুয়ে তুই বরং জল খা। আমি উঠি।

খুব হো-হো করে হাসে মলয়। বলে, সাবাস। এই তো কথা ফুটেছে।

রুকু দাঁড়ায় এবং বেশ তেজের গলায় বলে, আমার অনেক দোষ থাকতে পারে মলয়, কিন্তু আমি তোর মতো ক্রিমিন্যাল নই। তোর মতো ইতরও নই। একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে তুই কত দূর নেমেছিস! দয়ীর ঐ মেরুদণ্ডহীন জামাইবাবু কত টাকা দিয়েছে তোকে?

চুকচুক করে আবার সেই আফশোসের শব্দ করে মলয়। তারপর

বলে, থার্ড গ্রেড মেয়ে হলেও দয়ী দেখতে বেশ ভাল। আমি সুন্দরী মেয়েদের বিদেশে রফতানি পছন্দ করি না! আর সর্বনাশের কথা বলছিস রুকু? দয়ীর সর্বনাশ করতে পারে এমন বদমাশ আজও জন্মায়নি! বরং সর্বনাশ তার যে ওর পাল্লায় পড়বে। বোস, একটু হুইস্কি খা। ভাল স্কচ আছে।

না। রুকু গোঁয়ারের মতো মাথা নাড়ে। তবে বসেও যায়।

মলয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তুই গাড়ল হলেও তোর প্রতি আমার দুর্বলতা বড় বেশী। কোনোদিন তুই কারো ক্ষতি করিসনি। দয়ীর জামাইবাবু আমাকে কত টাকা দিতে পারে বলে তোর ধারণা? বলে চোখ ছোটো করে তীক্ষ্ণ নজরে রুকুকে খানিক দেখল মলয়। তারপর বলে, তুই গাড়ল না হলে এটা বুঝতে পারতিস যে, আমার বাবারও কিছু কম টাকা নেই। দয়ীর জামাইবাবু যা মাইনে পায় আমার নিজের মাসের রোজগার তার চেয়ে বহু গুণ বেশী। আমি আমার ল্যাবরেটরি আর প্রোডাকশন ইউনিটের জন্য জামাইবাবুকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনতে বলেছিলাম। লোকটা তাইতেই মাইনাস হয়ে গেল। তবে লোকটির সঙ্গে আমার অন্যরকম একটা সমঝোতা হয়েছে বটে। মস্ত ফার্মের বড় ইনজিনিয়ার। লোকটাকে হাতে রাখলে আমার কাজ হবে।

রুকু গম্ভীর মুখে বলে, সমঝোতাটা কি ধরনের?

মলয় রসিকতার ভাবটা ঝেড়ে ফেলল। থমথমে গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, আমার মিশন হল ধীরে ধীরে কলকাতার ইকনমিটা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া। ইট ইজ এ ডাম ডিফিকালট জব। অর্গানাইজড রাইভ্যালরি রয়েছে। আছে হাজারো বাধা। আমি একটা প্রোডাকশনে নামতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই দেয়ার আর বিগ

অফারস ফ্রম রাইভ্যাল গ্রুপ। সইকুমার নামে একটি ছেলে টাকার ফোয়ারা খুলে দিতে চাইছে। কিন্তু আমি জানি ওর সঙ্গে কোলাবরেশনে গেলে একদিন আমি হয়ে যাবো স্লিপিং অ্যাণ্ড সাইলেণ্ট পার্টনার। প্রোডাকশন কন্ট্রোল করবে ও। পাছে বাগড়া দেয় সেই ভয়ে ওকে আমি রিফিউজ করিনি। জানি সইকুমার একা নয়, ওর পিছনে রয়েছে অর্গানাইজড গ্রুপ। স্টেপিং-এ একটু ভুল হলেই ওরা আমার হাত থেকে সব ছিনিয়ে নেবে। তাই তলে তলে আমাকে প্রোডাকশনে নামার কাজে এগোতে হচ্ছে। জামাইবাবু হয়তো একজন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোক। কিন্তু হি ইজ এ ভেরী কমপিটেণ্ট ইনজিনিয়ার, ইতিমধ্যেই আমার প্রোডাকশন ইউনিটের ব্লু প্রিণ্ট তৈরী করে দিয়েছে। বেশ কিছু টাকা পাইয়ে দিচ্ছে লোন হিসেবে। ওর নিজের ফার্ম থেকেও বিস্তর জিনিস দেবে। তবু হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কেঁচে যাবে। সইকুমার তো একা নয়, স্বয়ং রাজ্য সরকারই সাইফার। আমার বাবা একবার প্রোডাকশনে নামবে বলে মস্ত কারখানা খোলার প্ল্যান নিয়েছিল। সরকার পুরো ব্যাপারটা ভাল করে দেখে-টেখে একদিন জানাল, এত বড় প্রোডাকশনে নামবার মতো যথেষ্ট টাকার জোর তোমার নেই। সেই একই স্পটে, প্রায় একই প্ল্যানিংয়ে এক মাড়োয়ারি লেটার অফ ইনটেণ্ট পেয়ে গেল। তার এখন রোরিং বিজনেস।

রুকু মাথাটা টিপে ধরে বসে ছিল। মলয়ের এই সব বড় বড় কথা সে বহুকাল ধরে শুনছে। কিছুতেই যে কিছু হবে না তা সে ভালই জানে। জানে না শুধু মলয়। সে বলল, ওসব আমি ভাল বুঝি না মলয়। আমি দয়ীর ব্যাপারটার একটা মীমাংসা চেয়েছিলাম।

মলয় যেন এক স্বপ্নের রাজ্য থেকে ফিরে এসে প্রথমটায় প্রসঙ্গটা

বুঝতেই পারল না। তারপর মাথা নেড়ে বলল, দয়ী! ওঃ দয়ী! শোন রুকু, আমি যে বিপুল সমস্যা ঠেলে চলেছি সেখানে রোম্যানসের নামগন্ধ নেই। একটা ফালতু মেয়ে কাকে বিয়ে করল বা না করল তাতে বয়েই গেল আমার। কদিন আগেও আমি ভাবছিলাম তোকে ফোনে ডেকে বলে দিই, দয়ীকে মুক্তি দিলাম। ও যা খুশি করুক। কিন্তু হঠাৎ এল জামাইবাবু। লোকটা দুনিয়াতে আর কিছুই চায় না, শুধু নিজের শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকের সর্বনাশ চায়। বিশেষ করে দয়ীর। বেচারা! এরকম অবসেশন আমি আর কারো দেখিনি। কিন্তু লোকটাকে আমার হাতে রাখতে হল। তাতে ভালই হয়েছে। হি হ্যাজ বিকাম দি গ্রেটেস্ট হেলপ টু মি। আমার মস্ত বড় প্রোজেকটের জন্য আমি কয়েক ডজন দয়ীকে কোতল করতে পারি, সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দিতে পারি।

তুই কি আজকাল মেয়েদের ভুলে যাচ্ছিস মলয়?

মলয় ভ্রূ কুঁচকে শানানো একখানা হাসি হেসে বলে, ভুলতে দিচ্ছে কই? দে আর কনস্টাণ্ট হ্যাজার্ডস্, যে জায়গায় মেয়েরা কাজ করে সেখানেই ভণ্ডুল। সেজেগুজে কামেশ্বরী হয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে ডামির মতো। ব্রেনলেস, কোয়ারলসাম, সেলফিস একটা স্পেসিস। যে বিষয়ে যোগ্যতা নেই সেই বিষয়েই কথা বলবে। আজকাল আমি মেয়েদের বাস্তবিক পুরুষের পথের বাধা বলে মনে করি। কোনোদিন ক্ষমতা হাতে পেলে আমি মেয়েদের সিধে বলে দেবো, ব্যাক টু কিচেন।

রুকু জিজ্ঞেস করে, তাহলে দয়ীর কী হবে?

মলয় মাথা নেড়ে বলে, কিছু হবে না। আপাতত জিয়ল মাছের মতো দয়ী থেকে যাবে। ওর জামাইবাবুকে আমার দরকার। দেশের জন্য, দশের জন্য দয়ীর মতো মেয়েদের কোনো স্যাক্রিফাইস নেই,

এমন কি নিজেদের পরিবারের জন্যও ওরা এক বিন্দু দায়িত্ব বোধ করে না। এবার দয়ীকে সেই স্যাক্রিফাইসটুকু করতে হবে।

উদ্ভট! উদ্ভট! বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে রুকু। তারপর বীয়ারে ঝিমঝিম করা মাথা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মলয়ের দিকে তর্জনী তুলে বলে, তোর মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। দয়ী ঠিকই বলেছিল, দেখো ওর একদিন পাগলামি দেখা দেবে।

খুব শান্তভাবে কথাটা নিল মলয়। তারপর বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, এ কথাটা দয়ী হয়তো মিথ্যে বলেনি। খানিকটা পাগলামি না থাকলে বড় কিছু করার কথা ভাবা যায় না। পাগলামি ছাড়া যে সব মানুষ আছে তাদের মনটাও নিতান্ত মধ্যবিত্ত। তারা বিজ্ঞের মতো দুনিয়ার সব বড় প্রচেষ্টাকেই পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে শেখে। সেটা না শিখলে আয়নায় নিজের মুখ দেখবে কোন লজ্জায়?

অনভ্যাসের বীয়ার রুকুর মাথাটা কোলে নিয়ে মগজে হাত ঢুকিয়ে সব ভাবনা চিন্তা ও যুক্তির বোধকে সস্নেহে এলোমেলো করে দিচ্ছে। রুকু তাই একটু নাটুকে হাসি হেসে বলে, বড় কিছু বলতে তো ফোর্থ গ্রেড ব্যবসা। আর ব্যবসা মানেই চোরের ওপর বাটপাড়ি, কালো টাকা আর লোক ঠকানো। তুই আর বড় কিছুর কথা ভাবতে পারলি না মলয়?

মলয় উঠে এসে পিঠ চাপড়ে দিল রুকুর। আদর করে বলল, দারুণ বলেছিস। দারুণ। তবু আবার বলি তোর সব ভাল। তবে একটু সাবালক হওয়া দরকার। মাস্টারবেটার, সাবালক হতে হলে একটু মেয়েমানুষ ঘাঁটতে হয়। দয়ীর হয়ে ওকালতি করছিস, ফীজ বাবদ একদিন চেখে দেখ না। বিয়ের আগে নেট প্র্যাকটিসটা হয়ে থাকবে। দয়ী কোনো পুরুষকেই রিফিউজ করে না। সেই যে ওদের বাড়ির

হ্যাণ্ডসাম চাকরটা ফ্যালা না কী যেন নাম, সেও ওর ক্লায়েন্ট।

রুকুর মাথাটা ঝুলে পড়ল। বলল, ছি ছি।

॥ দয়ী ॥

লুল্লুভুল্লু আমি একদম পছন্দ করি না। এসব হচ্ছেটা কি ?

ট্যারা বসনের গলার স্বর অনেক নীচু, অনেক ভদ্র। তবু তা ট্যারা বসনেরই গলা বলে চেনা যায়।

দয়ীর শরীরটা ভাল নেই। সকালবেলায় নিজের ঘরে চুপ করে শুয়ে আছে। আটটা বেজে গেছে। চড়চড়ে রোদ উঠেছে বাইরে। মোটা পর্দা টানা আছে জানালায় দরজায়, তাই বেলা বোঝা যায় না। তবু ভ্যাপসা গরম টের পাচ্ছে সে। সকাল থেকে লোড শেডিং। দয়ীর মাথা ধরে আছে রাত থেকে। অল্প জ্বর। গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা। তার চেয়েও যন্ত্রণা হঠাৎ এই সকালে ট্যারা বসনের এই হানাদারী। কোনোদিনই লোকটা এত সাহস পায়নি।

দয়ী খুব কৌতূহল বোধ করে দরজার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল। নিজের মেয়ে হলেও বয়সের মেয়ে, তাই ট্যারা বসন তার শোওয়ার ঘরে ঢোকেনি। পর্দার আড়াল থেকে ডাক দিয়ে তবে দরজার পর্দা সরিয়ে এপাশে এসে চৌকাঠেই আলিসান দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোমরে হাত। চোখ অত্যন্ত বিঘূর্ণিত।

দয়ী ঠাণ্ডা গলায় বলে, কী বলছ ?

বলছি লুল্লুভুল্লু আমি পছন্দ করি না। এসব দু নম্বরী মেয়েছেলের মতো কী করে বেড়াচ্ছো ? লোকে যাচ্ছেতাই বলে। দেশে ছেলের

অভাব নেই, বিয়ে বসলেই তো হয়।

হঠাৎ কী হল তোমার? সাতসকালে আজেবাজে কথা বলছো কেন?

তোমাদের সঙ্গে কথা বলা তো আমি ছেড়েই দিয়েছি। বাধ্য হলে বলতে আসি। কাল রাতে একটা ছোকরা ফোনে তোমার নামে খিস্তি দিচ্ছিল। প্রায়ই দেয়। কাল খুব অসহ্য লাগল। এর আগে জামাই এসে কীর্তন গেয়ে গেছে। এসব তো আগে শুনিনি। কী হচ্ছে সব?

কাল রাতে কে ফোন করেছিল?

তার আমি কি জানি। বরুণ না কি যেন নাম।

দয়ী সামান্য হাসল। বলল, ও বরুণ-টরুণ কেউ নয়। জামাই-বাবুই মাঝে মাঝে নাম ভাঁড়িয়ে ফোন করে আজকাল।

জামাই! খুব অবাক হয় ট্যারা বসন। ফর্সা মুখটা টকটকে লাল হয়ে ওঠে। চাপা গলায় বলে, ইতর।

দয়ী উঠে বসল। নাইটি হাঁটু পর্যন্ত উঠে ছিল, তা টেনে নামাল অলস হাতে। এলো চুল গোছা করে খোঁপা বাঁধল। বলল, দিদি আর খুব বেশী দিন বাঁচবে না। ঐ জানোয়ার ওকে তিল তিল করে মারছে, তুমি দেখতে পাও না? দিদিকে না তুমি আমাদের সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসতে?

ট্যারা বসন খর দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, সে তার বউকে কী করবে না করবে তার এক্তিয়ার। কিন্তু কুমারী মেয়েদের পিছনে লাগবে কেন এভাবে? লোকটা তো মরদ নয় দেখছি।

দয়ী উঠল। বলল, আমাকে নিয়ে তুমি ভেবো না।

ট্যারা বসন একটু রুখে উঠে বলে, ভাবতে চাই না বলেই সাবধান করে দেওয়া। বাতচিত যা করবে সিধে করবে। আমি সিধে কথার

মানুষ। সেই অ্যামেরিকার ছোকরাটা কী বলছে?

কী বলবে?

শুনলাম তোমাদের রেজিস্ট্রি সেদিন হয়নি। কেন হল না তাও আমাকে জানানো দরকার মনে করোনি তোমরা। শুধু ভদ্রতা করে জানিয়েছিলে যে, ঐ ছোকরার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে।

সব কথা কি তোমার শোনা দরকার?

যতদিন তোমার বিয়ে না হচ্ছে ততদিন আলবৎ দরকার। আমি মূর্খ হলেও তোমার গার্জিয়ান। বিয়ের পর তোমাদের কোনো ব্যাপারে নাক গলাতে যাবো না। সে তোমার গলা কেটে ফেললেও না। আমি কতগুলো নিয়ম মেনে চলি।

দয়ীর চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। বলে, জামাইবাবুর অত্যাচারে যদি দিদি কোনোদিন মরে যায় তাহলেও তুমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। কিছু করবে না?

বসন মাথা নাড়ে, না। স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে বাইরের লোকের কিছু করার নেই।

তার মানে দিদিকে তুমি আসলে ভালোবাসো না।

ট্যারা বসনের চোখ দুটো প্রচণ্ড জ্বলছিল। বলল, ওসব কথা ছাড়ো। অ্যামেরিকার ছোকরাটার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে না হয় তবে আমাকে বোলো। আমি সাত দিনের মধ্যে পাত্র ঠিক করে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবো। দু নম্বরী মেয়েছেলের মতো যা খুশি করে বেড়ানো আর চলবে না। লুল্লুভুল্লু একদম পছন্দ করি না।

তোমার পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করতে যাবো কেন? আমি কি খুকী? বেশ ঠাণ্ডা গলাতেই বলে দয়ী। যদিও তার ভিতরে রাগের ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

না যদি করো তবে সিধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। নিজের ইজ্জৎ নষ্ট করবে করো, কিন্তু বাড়ির ইজ্জৎ নষ্ট কোরো না।

ট্যারা বসন পায়ের দাপে বাড়ি কাঁপিয়ে বিদেয় হয়ে যায়। দয়ী ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে অবশ হয়ে বসে থাকে। অনেকক্ষণ বসে থাকে।

তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে। হুড়মুড় করে বাথরুমের কাজ সেরে লঘু একটু বাইরের সাজ করে নিয়ে গাড়িতে বেরিয়ে পড়ে। অফিসে বেরিয়ে পড়ার আগেই মলয়কে ধরতে হবে। মুখোমুখী হওয়াটা দরকার।

ভয়ংকর চেহারার মোটরসাইকেলটা সবে স্টার্ট দিয়েছে মলয়, ঠিক সে সময়ে দয়ীর গাড়ি এসে পিছনে দাঁড়াল। দয়ী ডাকল, শোনো মলয়।

মলয় ফিরে তাকায়। ঝকঝকে নীল ক্র্যাশ হেলমেট আর মস্ত রোদচশমায় একেবারেই অচেনা চেখাচ্ছে মলয়কে। হিংস্র, ভয়ংকর, শক্তিমান, রহস্যময় চেহারা। দয়ীর দিকে কয়েক পলক চেয়ে যেন চিনতে সময় নিল। তারপর বলল, হ্যালো দয়ী।

দয়ী গাড়ি থেকে নামে না। হাতছানি দিয়ে ডেকে বলে, গাড়িতে এসো।

মলয় মোটরসাইকেলটা হিঁচড়ে আবার স্ট্যাণ্ডে তোলে, ক্র্যাশ হেলমেটটা খুলে লম্বা চুল পাট করতে করতে গাড়ির জানালায় হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলে, কী খবর?

দয়ীর মুখ ফেটে পড়ছে রাগে, আক্রোশে। থমথমে গলায় বলে, গাড়িতে ওঠো। যেখানে যেতে চাও পৌঁছে দেবো।

পেট্রলের অনেক দাম দয়ী।

ইয়ার্কি কোরো না মলয়। আমার সিরিয়াস কিছু কথা আছে।

আর আমার আছে খুব সিরিয়াসতর কাজ। হৃদয়বেদনার ব্যাপার নিয়ে কথা বলার মতো সস্তা সময় কোথায় দয়ী? খুবই ভদ্র ও নরম গলায় বলে মলয়। তেমনি জানলায় ঝুঁকে, অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে।

আমি খুব বেশী সময় নেবো না। দয়ী অভিমানে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে।

হৃদয়ের ব্যাথার কথা কি সংক্ষেপে হয় দয়ী? বলতে বলতে কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে বেড়ে যায়। তোমার কাছে মাথা ধরার ট্যাবলেট আছে তো!

দয়ী গাড়ির ইনজিন চালু করে বলে, প্লীজ মলয়।

তবে দাঁড়াও। বলে মলয় গিয়ে তার ক্র্যাশ হেলমেট রেখে চাকরকে মোটর সাইকেল গ্যারেজে তুলতে বলে দিয়ে আসে।

দয়ী গাড়ি ছাড়তেই মলয় বলে, সোজা টেরিটিবাজার।

দয়ী গাড়ি চালাতে চালাতে কী ভেবে একবার দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। তারপর আড়চোখে মলয়ের মুখখানা একবার দেখে নেয়। খুবই ভাবলেশহীন কঠোর মুখ। কোনো ভাবাবেগ নেই, কোনো নরম রেখা নেই ওর মুখে। কাঠের মতো শক্ত ও নীরস মানুষ।

দয়ী যে-তেজে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল এখন তা অনেক নিভে গেছে। যখন কথা বলল তখন করুণ শোনাল গলা। বলল, তুমি কথা রাখোনি।

মলয় জবাব দিল না।

শুনছো? দয়ী একটু স্বর তুলে বলে, তুমি কথা রাখোনি। কথা ছিল, আমরা কোনোদিন রেজিস্ট্রির কথা প্রকাশ করব না। আমরা কোনো-দিন ব্যাপারটা স্বীকার করব না। তুমি কথা রাখলে না কেন মলয়?

মলয় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বাঁয়ে কেটে···বাঁয়ে কেটে!

দয়ী এক থামন্ত মিনিবাসকে ধাক্কা দিতে দিতে বাঁয়ে কেটে এক চুলের জন্য বেঁচে গেল। মিনিবাসের কণ্ডাক্টর দরজা দিয়ে বিস্ময়কর ভাবে ঝুঁকে পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, শালার এগারো হাতে কাছা হয় না আবার গাড়ি চালাচ্ছে।

রেসকোর্সের ধারে গাড়ি দাঁড় করাতে বলে মলয়, তারপর দয়ীর সঙ্গে জায়গা বদল করে নিয়ে হুইল ধরে। বলে, হৃদয়ে কি খুব বেদনা দয়ী? আজ খুব লুল্লুভুল্লু হয়ে যাচ্ছে তোমার।

লুল্লুভুল্লু কথাটা ট্যারা বসনের পেটেণ্ট। কবে কোন ফাঁকে মলয় সেটা সংগ্রহ করে রেখেছে। তার মুখে কথাটা শুনে এত সিরিয়াস অবস্থাতেও ফিক করে হেসে ফেলল দয়ী। আর হাসতেই কোন এক অদৃশ্য ম্যাজিকে মনের ভার নেমে গেল হঠাৎ। একটা শ্বাস ফেলে বলল, তুমি আজকাল খুব কাজের লোক হয়েছো শুনতে পাই। মারোয়াড়িদের হাত থেকে ব্যবসা কেড়ে নেওয়ার পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছো কাঁধে। সেইজন্যেই কি দেখা করারও সময় পাও না?

সময় পেলেও দেখা করার কি আছে?

কিছু নেই?

কিছু নেই।

মানছি। দয়ী মৃদু স্বরে বলে, কিন্তু আমার ওপর দাবি-দাওয়া তবে ছাড়ছো না কেন? কেন আজকাল প্রেমপত্র লেখো আমাকে? আমি তো জানি ওগুলো মোটেই প্রেমপত্র নয়, থ্রেটেনিং লেটার। ছেড়ে দিয়ে ফের কেন তেড়ে ধরছ? ছেলেমানুষী ইমোশনে রেজিস্ট্রি করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু পরে দুজনেই তো আলোচনা করে দেখেছি, এই বিয়ের কোনো মানে হয় না।

সবই ঠিক দয়ী।

তবে ? কেন এই অদ্ভুত কাজ করছো তুমি ?

মলয়ের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে কপালে। বলে, সবই ঠিক তবু কথা আছে দয়ী। আমার মনে হয় তোমার মতো মেয়ে যে ঘরে যাবে, যে পুরুষের বউ হবে সে, সেই ঘর এবং পুরুষ সারা জীবন ধরে জ্বলবে। তোমার বেসিক ফেইথফুলনেস নেই। তোমার মনের কোনো গভীরতা নেই। তাই তুমি যাতে সমাজ ও মানুষের খুব বেশী ক্ষতি করতে না পারো সেইজন্য আমি তোমাকে আটকাতে চেয়েছিলাম।

বাঃ ! চমৎকার কথা ! কবে থেকে এত বড় মানবদরদী হয়েছো মলয় ?

আজকাল একটু একটু ব্রডনেস আসছে দয়ী।

এটা ব্রডনেস নয় মলয়, মীননেস। আমি যতখানি খারাপ তুমি ততখানিই খারাপ। তুমি সেলফিস, ক্রুয়েল, কিলার, মীন।

মলয় মাথা নেড়ে বলে, ঠিক কথা। আমাকেও আটকানো দরকার। সে ভারটা তুমিই নাও না।

আমি তোমাকে ভীষণ ঘেন্না পাই।

উত্তেজিত হয়ো না দয়ী, আমি জানি তুমি বিনয়কে ভালবাসোনি, কোনদিন কাউকেই বাসতে পারবে না। সে ক্ষমতা তোমার নেই। যাকেই তুমি বিয়ে করবে তারই সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হবে নেহাৎ ফিজিক্যাল অ্যাণ্ড ফিনানসিয়াল। কিছুদিন পর তাকেও তুমি ঘেন্না করবে। এ সবই রুটিন।

তোমারও কি তাই নয় ?

বটেই তো ! তাই ভাবছিলাম ফল যখন একই তখন তোমাকে খামোখা অ্যামেরিকায় একসপোরট করে লাভ কি ? আমি হয়তো বা তোমাকে সামলাতে পারব, কিন্তু যে তোমাকে চেনে না বা জানে

না সে বেচারা ডুবজলে পড়বে। মেয়েদের লুল্লুভুল্লু আমি পছন্দ করি না দয়ী।

দয়ী হাসল না। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে অনন্ত ট্রাফিক জ্যামে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। অসহনীয় রোদের তেজ। গাড়ির ভিতরটা বয়লারের মতো তাতা। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। দয়ীর অস্থির লাগছিল। মলয় ধীর, স্থির, অবিচল। ঘাড় সোজা রেখে সামনে চেয়ে আছে।

দয়ী বলল, তুমি সিরিয়াসলি আমাকে বিয়ে করার কথা ভাবছ?

মলয় মাথা নেড়ে বলে, না। ক'দিন আগেও ওরকম একটা দুষ্টু-বুদ্ধি মাথায় এসেছিল বটে। কিন্তু এখন সেটা কেটে গেছে। আমি চাই, তুমি যেমন আছো তেমনি থাকো।

জামাইবাবু কি তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে?

না। বরং আমিই জামাইবাবুকে পরামর্শটা দিয়েছি।

আমাকে চিরকাল ঠুঁটো করে রাখতে চাও?

একজ্যাকটলি। ভুলে যেও না, প্রথম একসঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব তুমিই করেছিলে। রেজিস্ট্রির আইডিয়াও প্রথম তোমার মাথাতেই এসেছিল। নিজের কবর তুমি নিজেই খুঁড়েছো দয়ী। আমাকে তার জন্য দায়ী করাটা ঠিক হবে না।

তুমি ব্ল্যাকমেল করছো।

আমি তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ব্ল্যাকমেল তাকেই করা যায় যার কিছু লুপহোল থাকে।

দয়ী চুপচাপ কিছুক্ষণ রুমাল কামড়ায়। তারপর বলে, বিনয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে তুমি খুব সাকসেসফুলি আটকেছো মলয়। কিন্তু এর পরের বার তা আর পারবে না। আমি ডিভোর্সের মামলা আনব।

সেটাই তো উচিত ছিল।

তখন তো আটকাতে পারবে না।

হয়তো পারব না। কোনো মানুষকে খুন না করে পুরোটা দখল করা যায় না। খুন আমি ছেড়ে দিয়েছি। তুমিও একদিন মুক্তি পাবে।

দয়ী কথা বলল না। এসপ্ল্যানেডের ট্র্যাফিকের জট ছেড়ে গাড়ি শামুকের মতো বেন্টিংক স্ট্রীটের মুখে এসে পড়ল। লালবাজারে আবার জ্যাম। গরমে ভেপে উঠছে ছোটো গাড়ির ভিতরটা।

দয়ী রুমাল কামড়ায়। তারপর আক্রোশে ফোঁসফোঁস্যানির মতো শব্দ করে বলে, বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে।

মলয় ধীর স্বরে বলে, সেটাও কোনো প্রবলেম নয়। তোমার অনেক পথ আছে।

জানি, তুমি চাকরি করতে বলবে। মেয়েদের হসটেল বা মেসে গিয়ে থাকতে বলবে।

কিংবা কোনো আশ্রমে। গিধনীতেই তো সৎসঙ্গের একটা চমৎকার আশ্রম রয়েছে।

মলয়ের মুখে গিধনীর উল্লেখ শুনে একটু চমকে ওঠে দয়ী। তার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা সাইরেন বেজে ওঠে। একবার মলয়ের দিকে তাকায় সে।

মলয় সামনের দিকে চেয়ে থেকেই মৃদুস্বরে বলে, জায়গাটা তোমার খারাপ লাগবে না। সেখানে তোমার জন্যই একটা ছেলে খুন হয়েছিল।

বহুকাল ধরে এই একটা প্রসঙ্গ ভুলে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে দয়ী। পারছে না। ঘুরে-ফিরে সেই স্মৃতি এসে হানা দেয়। মলয় তাকে কেন এত ঘেন্না করে তা কি সত্যিকারের জানে না দয়ী? জানে। রুকু যেদিন ফোনে ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিল সেদিনও

আপাদমস্তক জুড়ে একটা স্টিমারের ভোঁ বেজে উঠেছিল। নাকি সাইরেন? সে চাপা স্বরে বলল, বোলো না, তোমার পায়ে পড়ি।

কেন, শুনলে কি ভয় পাও? নাকি অনুশোচনা আসে?

কিছু একটা হয়।

খুব ভাল, খুব ভাল। কিছু একটা অন্তত হচ্ছে। সেটাই আশার কথা!

দয়ী থম্ ধরে থাকে কিছুক্ষণ। এই নরকের মতো ভাপসা গরমে তার মাথা তেতে উঠছে। বশে থাকছে না তার মাথা। অভিমানভরে সে বলল, এসব তুমি রুকুকেও বলেছো মলয়। কাজটা ঠিক করোনি।

আমার কিছু গোপন করার নেই। তোমার হয়তো আছে।

দয়ী মাথা নত করে থাকে।

অনন্ত, জটিল, ভয়ংকর এক জ্যামে গাড়ি আটকে থাকে। গাড়ির ছোট্ট কুঠুরি আরো ভেপে যায়, চনচনে গরম হয়ে ওঠে ধাতব যন্ত্রপাতি। ক্রমান্বয়ে চারদিককার গাড়ির হর্ণ আর মানুষের অসহ্য চিৎকার চেঁচামেচি আক্রমণ করে প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে। জ্যামে আটক মানুষ ক্লান্তিতে আধোঘুমে ঢলে পড়তে পড়তে খোলা অবারিত পথ, সবুজ ঘাসের দেশ আর নিস্তব্ধতার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

দয়ীর বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাচ্ছিল। এই ভরদুপুরেও সে জেগে থেকে এক দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠল ভয়ে। মাথা ঠিক থাকল না। মলয়ের স্টিয়ারিঙে রাখা একখানা হাত চেপে ধরে বলল, তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। আমাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও।

কোন কৌশলে মলয় গাড়িখানাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাল তা বুঝতেই পারল না দয়ী। তারপর দয়ীর দিকে চেয়ে বলল, তোমাকে খামোখা এই জ্যামে আর বেশীদূর টেনে নেবো না। আমার

অফিস আর খুব দূরে নয়। তুমি এখান থেকেই ফিরে যাও দয়ী।

দয়ী বেখেয়ালে মলয়ের হাত থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল। এখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তুলে আনল হাতখানা। দেখল, তার নরম করতল মলয়ের পুরুষ শরীরের ঘামে ভিজে আছে। কিন্তু তাতে ঘেন্না পেল না দয়ী।

॥ সরিৎ ॥

বারান্দায় ফুলের টবে চারা গাছ বসাচ্ছিল সরিৎ। এমন সময়ে বর্ষার জলভারনত মেঘ এল আকাশ ভরে। সময় ছিল না, কয়েকটা ঝিলিক হেনে বড় বড় পদক্ষেপে হেঁটে চলে এল বৃষ্টি। মুহূর্তেই গ্রাস করে নিল চরাচর।

ঘরের ভিতরে এসে দরজাটা দিয়ে দিল সরিৎ। বাথরুমে যাওয়ার সময় দেখল, সোফায় বসে মৃন্ময়ী নিজের মাথা টিপে ধরে চোখ বুজে আছে। একটু আগেই অনেক বমি করল। বারান্দা থেকেও শব্দ পাচ্ছিল সরিৎ।

থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন লাগছে?

ভাল না। মৃন্ময়ী বলে।

মৃন্ময়ীর গর্ভসঞ্চারে সরিৎ কি খুশি? বাথরুমের বাইরে বেসিনে মাটিমাখা হাত ধুতে ধুতে দেয়ালের আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে সরিৎ। তার গোলগাল মেদবহুল মুখে কোনো ভাবান্তর বোঝা যায় না।

আজ বাবুন বিকেলে ওর স্কুলের একটা ফাংশনে গেছে। ফাংশনের

শেষে স্কুলের গাড়ি এসে দিয়ে যাবে। বাড়িটা তাই বড় ফাঁকা। বাবুনকে ছাড়া সরিতের প্রতিটি মুহূর্তেই একটা অভাব বোধ হয়।

সে নিঃশব্দে গিয়ে বাবুনের পড়ার টেবিলে বসে বইপত্র খুলে দেখছিল কিন্তু মন দিতে পারল না। ওঘরে কি মৃন্ময়ী ওয়াক তুলল একবার?

সরিৎ বিড় বিড় করে বলল, হবে না? অত ঘুমের বড়ি খেলে এ অবস্থায় বমি-টমি হতেই পারে।

নিঃশব্দে মৃন্ময়ীর ঘরে ঢুকে সে টেবিল থেকে সমস্ত ঘুমের ওষুধ-গুলো তুলে আনে। নিজের লকারে চাবি দিয়ে রেখে দেয়। একটু ইতস্তত করে সে। তারপর গোদরেজের আলমারি খুলে মৃন্ময়ীর সেই আত্মহত্যার চিরকুটটা বের করে। কোনো মানে নেই এটার। এই চিরকুট তাকে প্রতি মুহূর্তেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করে দিচ্ছে। কাগজটা ছিঁড়ে জানালা দিয়ে বৃষ্টিতে বিসর্জন দেয় সরিৎ।

তারপর সোফায় মৃন্ময়ীর পাশে গিয়ে চুপচাপ বসে।

মৃন্ময়ী টের পায়। একটা হাত বাড়িয়ে তার কোলে রাখে। চোখ খুলে খুব ম্লান একটু হেসে বলে, খুব ক্রেডিট, না?

কিসের ক্রেডিট?

এই যে আবার বাচ্চার বাবা হতে চলেছো!

বাইরে বৃষ্টির তাণ্ডব। ফাঁকা বাড়ি। বহুদিন হয় ভুলে যাওয়া শরীরের আবার জেগে ওঠা। সব শপথ ভেসে যায় সরিতের। কাঁপা হাতে সে মৃন্ময়ীর মুখটা ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে নির্লজ্জের মতো চুমু খায়। তারপর টেনে নেয় নিজের দিকে! অস্ফুট স্বরে বলে, আজ রাত থেকে আমরা একসঙ্গে শোবো।

অনেকক্ষণ বাদে আদর শেষ হলে মৃন্ময়ী ঝকমকে চোখে সরিতের

দিকে তাকায়। ঠোঁটে সরল একটা আনন্দের হাসি। তারপরই একটু গম্ভীর হয়ে বলে, সামনের সপ্তাহে বিনয় ঠাকুরপো চলে যাচ্ছে। দয়ীর কী হবে?

সরিৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে, কী হবে তার আমি কি জানি!

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বলে, আমি জানি তোমার মন কত বড়। তুমি ইচ্ছে করলেই ওদের মিলিয়ে দিতে পারো।

পারি না মৃন্ময়ী।

কেন পারো না? তুমি বললেই মলয় সরে দাঁড়াবে।

সরিৎ মুখখানা তোম্বা করে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবে। তারপর আস্তে করে বলে, মলয় বা দয়ীর প্রবলেম আমরা ঠিক বুঝব না। ও নিয়ে কিছু ভেবো না মৃন্ময়ী। মনে কোরো না যে, আমি বাধা দিয়েছিলাম বলেই জট এত পাকিয়েছে। জট পাকিয়েই ছিল। ওদের সময় দাও। হয়তো নিজেরাই একদিন সল্‌ভ করতে পারবে।

যদি না পারে? দয়ী যদি আত্মহত্যা করে?

সরিৎ আবার তোম্বা মুখে কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর একটা শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে। বলে, বিশ্বাস করো, সেই আত্মহত্যার জন্য আমি দায়ী নই।

॥ মলয় ॥

আপনি লেটার অফ ইনটেন্ট পেয়ে গেছেন মলয়বাবু! ভেরী গুড। আমার সঙ্গে আপনি ট্রেচারি করলেন, কিন্তু আমি মাইণ্ড করি না। আই অ্যাম এ স্পোর্টসম্যান। প্রোডাকশনে নামতে

যাচ্ছেন, সেও খুব ভাল কথা। কিন্তু মনে রাখবেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে পাওয়ার শর্টেজ, র মেটেরিয়াল বোমবাইয়ের হাতে। ইট উইল নট বি অ্যান ইজি জব।

মলয় সইকুমারের মুখের দিকে খুনীর চোখে চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবিক সইকুমারকে সে দেখছেও না বা তার কথা নিয়ে ভাবছেও না। সে বেশ বুঝতে পারছে এখন, সমস্যাবহুল এই পশ্চিমবঙ্গে তার প্রোডাকশন ইউনিট বেধড়ক মার খাবে।

সইকুমার একটু ঝুঁকে বন্ধুর মতো বলে, লেবার ট্রাবলের কথাটাও ভুলে যাবেন না। এই স্টেটের মতো ডিস্ওবিডিয়েন্ট, ইনসিনসিয়ার অ্যাণ্ড অ্যাগ্রেসিভ লেবারার আর কোথাও নেই। গভর্ণমেণ্ট আপনাকে লেটার অফ ইনটেণ্ট দিয়েছে ওনলি টু ফিনিশ ইউ। যারা ক্লেভার তারা অন্য জায়গায় বেস করার চেষ্টা করছে। আমি এখনো বলছি হরিয়ানা চলুন। দেয়ার আর সো মেনি পসিবিলিটিজ। দিস স্টেট ইজ ইন দি হ্যাণ্ডস অফ কমিউনিস্টস।

মলয় জ্বালাধরা চোখ দুটো দিয়ে সইকুমারকে ছাই করে দিতে পারত। কিন্তু তা করল না। বলল, আমি ভেবে দেখব সইকুমার।

কত আর ভাববেন? বাঙালি বেশী ভাবে বলেই তো কাজ হয় না। আমি আপনাকে সাত দিন সময় দিচ্ছি। আফটার সেভেন ডেজ দিস অফার উইল নট বি ভ্যালিড।

সইকুমার উঠে চলে যায়।

পুণ্য তার টিনের চেয়ারে পাথরের মতো বসে ছিল। এখন একটু নড়ল। তারপর হঠাৎ বলল, তাই চলুন।

মলয় একটু অবাক হয়ে বলে, কোথায়?

পুণ্য গম্ভীর মুখে বলে, আপনি যা ভাবছেন তা হওয়ার নয়।

সকাল থেকে কারেন্ট নেই। সইবাবু মিথ্যে বলছেন না।

মলয় কথাটার জবাব দেয় না। ভাবতে থাকে। সইকুমার কেমন লোক তা বুঝতে পারছে না। তবে এটা বুঝতে পারছে, লোকটা মিথ্যে বলেনি। সে যে স্বপ্ন দেখছিল এতদিন, তা হওয়ার নয়। সে একটা গভীর শ্বাস ছাড়ল। পুণ্যকে চা দিতে বলল।

চা খেয়ে ক্র্যাশ হেলমেট বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মলয়।

চারশো সি-সির ভয়ংকর হোণ্ডা মোটর সাইকেলটা গজরাতে থাকে বাঘের মতো। কলকাতার ঘিঞ্জি জটপাকানো রাস্তায় তার তীব্র গতিকে বার বার সংযমে বেঁধে রাখতে হয় বলেই কি তার রাগ?

মলয় আজ এই ভরা মেঘের তুপুরে মোটর সাইকেলটাকে বলল, আজ খেল দেখানোর চানস দিচ্ছি তোকে। আজ মন ভাল নেই।

ভাল লাগে না, কিছুতেই ভাল লাগে না কলকাতার এই জট। তার কেবলই মনে পড়ে বীরভূমের খোয়াই, বাঁকুড়ার রোদে-পোড়া মাঠ, জলহীন তুঃখী গাঁ, চাষী মানুষের এবড়ো-খেবড়ো মুখ। বুড়ি কলকাতার যৌবনহীন দেহ আর কত ভোগ করবে মানুষ? প্রকৃতি-হীন, শুষ্ক ছিবড়ে এই শহর তার মুমূর্ষু শরীরে শেষ ধর্ষণের ক্লেশ সহ্য করছে মাত্র। তার শ্বাস ওঠার শব্দ পায় মলয়। কলকাতাকে কেউ কোনোদিন ভালবাসতে পারেনি। হয়তো সেই প্রেমহীনতাই তার মৃত্যুর কারণ হবে একদিন। সেদিনের বেশী দেরীও নেই। নিভে যাচ্ছে আলো, রাস্তার জ্যামে অনির্দিষ্টকাল থেমে আছে গাড়ি, জল ফুরিয়ে আসছে, বন্দর অচল হয়ে এল, এসপ্ল্যানেডে পাশাপাশি পড়ে আছে মানুষের মল ও মৃতদেহ।

কলকাতার জট ছাড়িয়ে অবারিত বম্বে রোডে পড়ে হোণ্ডা তার ঘুমন্ত গতিকে জাগিয়ে তোলে। দাঁতে দাঁত চাপে মলয়। একশ

ছাড়িয়ে দেড়শ কিলোমিটারে লাফিয়ে চলে গেল কাঁটা। নাক আর ঢাকা কানের ফুটো দিয়ে বাতাসের তীব্র ঝড় ঢুকে তার মাথা থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল লেটার অফ ইনটেন্ট, প্রোডাকশন, কলকাতার অর্থনীতির লাগাম ধরার শপথ। দূরপাল্লার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ট্রাককে বাঁয়ে ফেলে ফেলে ভৌতিক গতিতে ছুটে যাচ্ছে হোণ্ডা। এত জোরে মলয় কখনো চালায়নি আগে। দুই শক্ত হাতে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে উপুড় হয়ে আছে সে। কোথায় যাচ্ছে?

সামনেই একটা ব্রীজ। স্পীড ব্রেকারের সতর্কবাণী চোখে পড়ল না মলয়ের। কেন পড়ল না তা কে জানে। মলয়ও জানত না। তবে মনের গভীরতম প্রদেশে সে ঠিকই টের পেয়েছিল আজ শুধু যাওয়ার দিন, ফেরার নয়। নইলে সব ব্রীজেরই আগে স্পীড ব্রেকার থাকে একথা সে ভোলে কি করে? যখন সময় হয় তখন রন্ধ্রপথেই কাল-নাগিনী এসে ঢোকে। কেউ কেউ তা টের পায়।

মলয় হঠাৎ দেখল একটা ধাক্কা খেয়ে তার বিশ্বস্ত মোটরসাইকেল অনেকটা আকাশে উঠে গেল। ভারী অবাক হল মলয় যখন দেখল, মোটর সাইকেল নামছে অন্তত দশফুট শূন্য থেকে। নীচে ব্রীজের লোহার কাঠামো, ঢালু গড়ানো জমি, অনেক নীচে চিকমিক করছে খানিকটা জল।

শেষ মুহূর্তেও মোটরসাইকেলটার রাশ টেনে রাখার চেষ্টা করল সে। একটুও ভয় করল না। মোটরসাইকেলে এত উঁচুতে শূন্যে কোনো-দিন ওঠেনি সে। ব্যাপারটা খুবই উপভোগ করল। তারপর পড়ল।

কিছুই তেমন টের পেল না মলয়। শুধু দেখল একটা মস্ত খরার মাঠে প্রথম বৃষ্টির ঢল নেমেছে। কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! মৃদু একটু হাসলও সে বোধ হয়।

॥ রুকু ॥

বম্বে ফ্লাইটের যাত্রীদের সিকিউরিটি চেক-এর জন্য ডাকা হচ্ছিল। লাউঞ্জে এক-ভীড় লোকের মধ্যে দয়ী বসে কাঁদছে। সিঁথি সিঁদুরে ভর্তি। কত পবিত্র দেখাচ্ছে ওকে। রুকু মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। ট্যারা বসন সস্নেহে পিঠে হাত দিয়ে বলল, ওঠো মা।

দয়ী ওঠে।

রুকু এতক্ষণ ভীড়ের মধ্যে দয়ীর নাগাল পায়নি। এবার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, একা যাচ্ছো, সাবধানে যেও দয়ী।

দয়ী মৃদু হাসল। মাথা নেড়ে বলল, আজকাল ভয়ের কিছু নেই।

তবু অনেক দূরের পথ তো। বিদেশ।

আমার ভয় করছে না রুকু। কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট।

নিউ ইয়র্কে পৌঁছে চিঠি দিও। ফিলাডেলফিয়ায় পৌঁছে আবার।

দেবো।

তারপর গলা একটু খাটো করে রুকু বলে, টেপরেকর্ডারের কথা মনে আছে তো!

হেসে দয়ী মাথা নাড়ে, আছে রুকু। ঠিক পাঠাবো। সবার আগে তোমারটা।

রুকু সিকিউরিটি এনক্লোজার পর্যন্ত এগিয়ে দেয় দয়ীকে। এক-ভীড় লোক ঘিরে ধরে ফের। ট্যারা বসন, মৃন্ময়ী, সরিৎ, দয়ীর আরো ভাইবোন, আত্মীয়, বন্ধু এবং বান্ধবী। সকলেই কথা বলতে চাইছে।

রুকু একটু সরে আসে। এবার কলকাতায় বড় শীত পড়েছে।

নিউ ইয়র্কে হয়তো বরফ পড়ছে। কোনোদিন সেই বরফ দেখা হবে না রুকুর।

সকলের অলক্ষ্যে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। লাউঞ্জের ঠিকরে-আসা আলোয় ঝকঝক করছে তার নতুন স্কুটার। সে ভারী তৃপ্তি ও অহংকারের সঙ্গে সীটে উঠে স্টার্ট দেয়।

বেরোনোর সময় তার বউ মঞ্জুলা রোজ বলে দেয়, সাবধানে স্কুটার চালাবে। আজকাল ভীষণ অ্যাকসিডেন্ট হয় কিন্তু।

সেটা জানে রুকু। একটা ছোটো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তাকে মাস্টারবেটার বলার আর কেউ নেই। কেউ আর তাকে বিয়ের পণ বা যৌতুক নিয়ে খোঁটা দেবে না। বিনয়ের সঙ্গে দয়ীর বিবাহিত জীবন ফিলাডেলফিয়ায় নির্বিঘ্ন হবে বলেই মনে হয়।

রুকু জানে সে কোনোদিন বিপ্লব করবে না, খুন করবে না, বন্দুক পিস্তল ছোঁবে না, সে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিজের হাতে নেওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠবে না। কোনোদিন চারশো সি সি-র ভয়ংকর হোণ্ডাও চালাবে না সে। তার কাছে কোনো মেয়ের নেই অপরিশোধ্য শরীরের ঋণ। রুকুকে বেঁচে থাকতে হবে। রোজ বাড়ি ফিরতে হবে নিরাপদে। কতগুলো প্রাণী তাকিয়ে আছে তার দিকে!

খুবই সাবধানে রুকু স্কুটার চালাতে থাকে।

—